বেতারবাংলা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩০

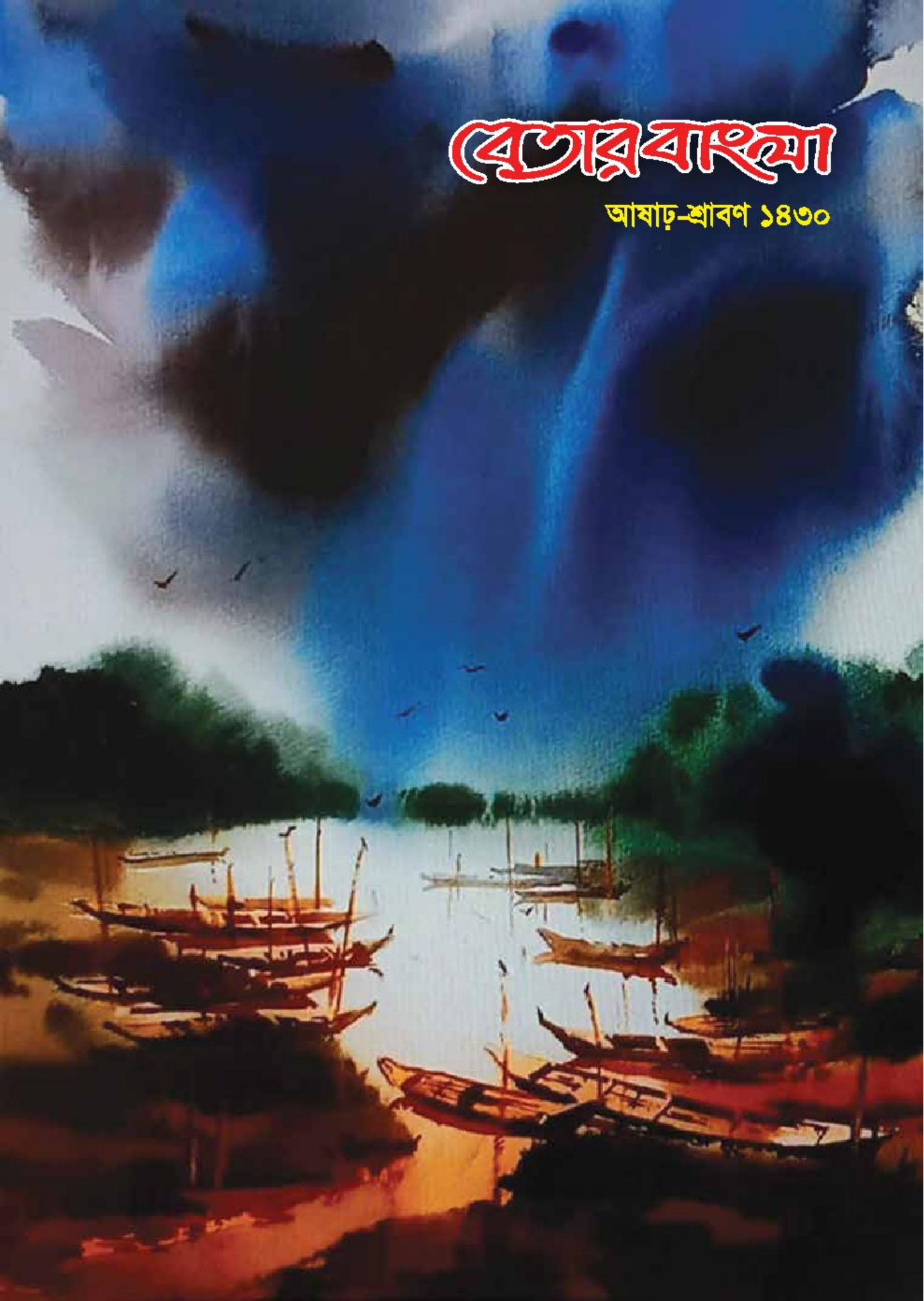

৭ মে ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এর নিকট বঙ্গভবনে বার্ষিক অডিট ও হিসাব রিপোর্ট হস্তান্তর করেন বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী

২০ মে ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাক্ষাৎ করেন

৮ জুন ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের কাছে ঢাকায় বঙ্গভবনে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২' পেশ করেন

বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩০ ● ১৫ জুন ২০২৩ - ১৫ আগস্ট ২০২৩

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারুফ ইলাহি

প্রচ্ছদ
খাদিজা খানম অন্তরা

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন:০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ক্যাশ)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সম্পাদকীয়

ঋতুবৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। এদেশের প্রতিটি ঋতুই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ঋতুচক্রের পালায় বর্ষা আসে তার স্নিগ্ধ সজল রূপ নিয়ে। ব্যাপ্তিতে, বৈচিত্র্যে বাংলাদেশের বর্ষাকালের তুলনা নেই। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসেই ঘটে তার উন্মুক্ত প্রকাশ। এসময় সে আপন মনের মাধুরী সাজিয়ে বাংলার প্রকৃতিকে সবুজে সবুজে একাকার করে তোলে। বর্ষায় বাংলার প্রকৃতি যেন রূপ-বৈচিত্র্যে নবরূপ ধারণ করে। আর তাই বাঙালি-জীবনে বর্ষার প্রভাব অপরিসীম।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জীবনে পবিত্র ইদ-উল-আযহা এবং কোরবানির গুরুত্ব সীমাহীন। কোরবানি শব্দের অর্থ নৈকট্য, ত্যাগ, উৎসর্গ। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই এ কোরবানি। কোরবানির ইদ পালনের মাধ্যমে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আল্লাহর প্রিয়বান্দা ও নবি হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.) এর অতুলনীয় আনুগত্য এবং মহান ত্যাগের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করে। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হোক পবিত্র ইদ-উল-আযহা- এই আমাদের প্রত্যাশা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী একজন মানুষ ছিলেন। দেশ ও সমাজভাবনায় শহিদ শেখ কামাল মাত্র ২৬ বছরের জীবনে বাঙালির সংস্কৃতি ও ক্রীড়াক্ষেত্রের এক বিরল প্রতিভাবান সংগঠক ও উদ্যোক্তা হিসেবে অসামান্য উচ্চতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর মেধা ও রুচির প্রয়োগ ঘটিয়ে তরুণ প্রজন্মকে যে সুন্দর ও সম্ভাবনার পথ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, সেই পথটি যেন আমরা খুঁজে নিতে পারি। ৫ আগস্ট তাঁর জন্মদিনে জানাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

২২ শ্রাবণ বাঙালির আত্মিক মুক্তি ও সার্বিক স্বনির্ভরতার প্রতীক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের নায়ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮২তম মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর গান-কবিতা, বাণী এই অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তির ক্ষেত্রে প্রভূত সাহস যোগায়। চিরকালই কবির রচনাসমূহ বাঙালির মাঝে প্রাণের সঞ্চার করে।

মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন যোগ্য সহচর এবং বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সহযোদ্ধা। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে একজন নীরব দক্ষ সংগঠক হিসেবে গৌরবময় ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৩০ সালের ৮ আগস্ট গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাংলার মানুষের কাছে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার নাম। বাঙালি জাতি প্রতিনিয়ত সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

৩

ছয়-দফা থেকে স্বাধীনতা
মোহাম্মদ শাহজাহান ৪

বাংলা সাহিত্য ও বর্ষা ঋতু
জায়েদুল আলম ৯

শান্তি-শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও বিশ্বনিরাপত্তার মহাসম্মেলন
মাওলানা মুফতি মোঃ ওমর ফারুক ১৪

অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন শেখ কামাল
ড. সুলতান মাহমুদ ২০

সংকটে সংগ্রামে 'নির্ভীক' এক নারী
শামস সাইদ ২২

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী শিলাইদহ
আরিফা খানম ২৬

পবিত্র মুহররম ও আশুরার তাৎপর্য
আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ কাজী মারুফ বিল্লাহ্ ২৯

গণসম্প্রচারের ইতিবৃত্ত (১৯২২ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ): বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (৩য় পর্ব)
দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব ৩১

গল্প

সমুর দিনরাত্রির কথকতা
জাকিয়া সুলতানা ১৭

বেতার সংবাদ ৯৯

বেতার আলপনা ১০১

১০৩

কবিতা

নিঝুমকন্যা
প্রত্যয় জসীম ১৩

বর্ষার কদম
মোখলেছা খাতুন ১৩

বোদলেয়ার পড়ছি যেই
অনিরুদ্ধ আলম ১৩

মেঘ-মল্লার ভোরে
এস এম তিতুমীর ২৫

সেদিন ছিল পহেলা আষাঢ়
শামীমা নাইস ২৫

পাখিজাত স্বভাব
রফিকুল নাজিম ২৫

তরুপল্লব

পুঁটি মাছের বিপদ
মুহাম্মদ বরকত আলী ৩৫

বুড়ো বটগাছ
জেসমিন সুলতানা চৌধুরী ৩৬

জলের মেয়ে বৃষ্টিবালা
সুবর্ণা দাশ মুনমুন ৩৬

দস্যিছেলে
নকুল শর্মা ৩৬

ভাল্লাগে না পড়া
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩৭

দুরন্ত কুঁড়ি
টি এইচ মাহির ৩৭

জারা মণি
আলমগীর কবির ৩৭

খোকা খুকু
মোহাম্মেদ সাইফুল হাসান রাকিব ৩৭

বেতার পর্ব

পবিত্র ইদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৩৯
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৫১
শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৬১
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৬৭
বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৭৮

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৮৬
বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি ৮৮
বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটারসমূহ ৯০
বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন ৯৩

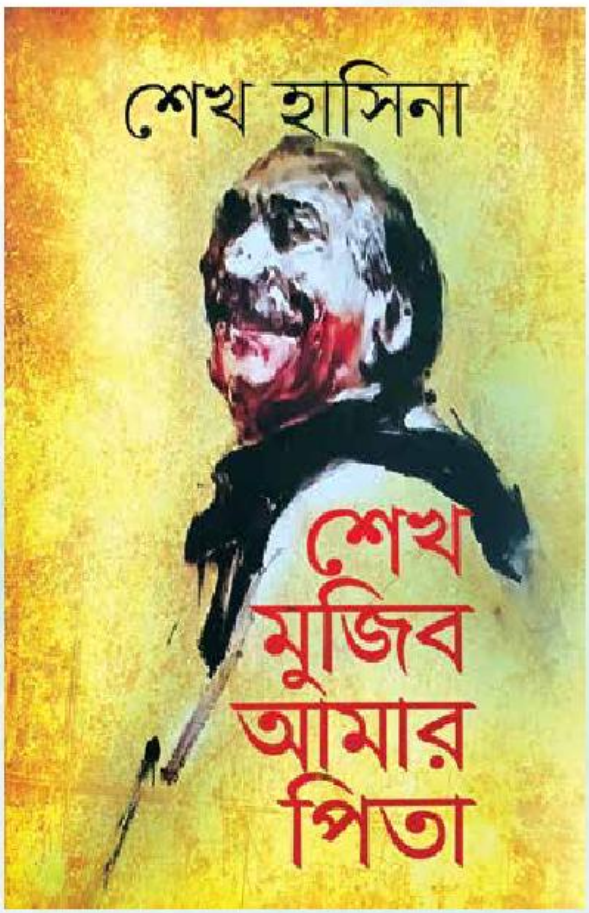

আমাদের পূর্ব পুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাড়ি থেকে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূর। আমার আব্বা এই স্কুলে প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুলে থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। আর একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট। সেই স্কুল থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার কর্মস্থল ছিল। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারীপুর বদলি হন। তখন কিছুদিনের জন্য মাদারীপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তাঁর কৈশোর বেলা কাটে।

আমার আব্বার শরীর ছিল বেশ রোগা। তাই আমার দাদি সবসময়ই ব্যস্ত থাকতেন কিভাবে তাঁর খোকার শরীর ভালো করা যায়। আদর করে দাদা-দাদিও খোকা বলেই ডাকতেন। আর ভাইবোন গ্রামবাসীদের কাছে ছিলেন 'মিয়াভাই' বলে পরিচিত। গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। আমার দাদি সবসময় ব্যস্ত থাকতেন খোকার শরীর সুস্থ করে তুলতে। তাই দুধ, ছানা, মাখন ঘরেই তৈরি হতো। বাগানের ফল, নদীর তাজা মাছ সবসময় খোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু আমার আব্বা ছোট্ট বেলা থেকেই ছিপছিপে পাতলা ছিলেন, তাই দাদির আফসোসেরও সীমা ছিল না কেন তার খোকা একটু হৃষ্টপুষ্ট নাদুশ-নুদুশ হয় না। খাবার বেলায় খুব সাধারণ ভাত, মাছের ঝোল, সবজিই তিনি পছন্দ করতেন। খাবার শেষে দুধ-ভাত-কলা ও গুড় খুব পছন্দ করতেন। আমার চার ফুফু ও এক চাচা ছিলেন। এই চার বোনের মধ্যে দুই বোন বড় ছিলেন। ছোট্ট ভাইটির যাতে কোনো কষ্ট না হয় এজন্য সদা সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন বড় দুই বোন। বাকিরা ছোট্ট কিন্তু দাদা-দাদির কাছে খোকার আদর ছিল সীমাহীন। আমাদের বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমার দাদার ও দাদির বোনদের ছেলে-মেয়ে বিশেষ করে যারা পিতৃহারা-মাতৃহারা তাদেরকে দাদা-দাদি নিজেদের কাছে এনেই মানুষ করতেন। আর তাই প্রায় সতেরো আঠারো জন ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠে।

আব্বার বয়স যখন দশ বছর তখন তাঁর বিয়ে হয়। আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। আমার মা পিতৃহারা হবার পর তার দাদা এই বিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি মা ও খালার নামে লিখে দেন। আমার খালা মায়ের থেকে তিন চার বছরের বড়। আত্মীয়ের মধ্যেই দুই বোনকে বিয়ে দেন এবং আমার দাদাকে (গার্জিয়ান) মুরুব্বি করে দেন। আমার মার যখন ছয়-সাত বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান এবং তখন আমার দাদি কোলে তুলে নেন আমার মাকে। আর সেই থেকে একই সঙ্গে সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মানুষ হন।

ছয়-দফা থেকে স্বাধীনতা

মোহাম্মদ শাহজাহান

৭ জুন বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিন। ১৯৬৬ সালের এই দিনে আওয়ামী লীগ আহুত হরতাল পাকিস্তানের প্রথম স্বৈরশাসক ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোঃ আইয়ুব খানের তখ্তে তাউস কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ঐদিনের হরতালে সরকারি হিসেবেই ৬ জন নিহত হওয়ার কথা বলা হয়। বেসরকারি হিসেবে ঐ সংখ্যা ছিল আরো অনেক বেশি। স্বাধিকার অর্জন এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগ ওইদিন হরতাল আহ্বান করে। ৭ জুনের মাত্র ৪ মাস আগে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও জাতির সামনে ছয়-দফা দাবি পেশ করেন। ছয়-দফা দৃশ্যত পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি হলেও এর মধ্যে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল। আর এ জন্যই ছয়-দফা দেয়ার সাথে সাথেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান অস্ত্রের ভাষায় হুমকি দেন এবং তাঁর বশংবদ গভর্নর মোনায়েম খান পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মী গ্রেফতারসহ বর্বর দমননীতি শুরু করেন। ছয়-দফার জনক শেখ মুজিব নিশ্চিতভাবেই জানতেন, শাসকচক্র ওই দাবি মানবে না। বাংলার ও বাঙালির প্রিয়নেতা শেখ মুজিব এটাও জানতেন, শাসকগোষ্ঠী যখন ছয়-দফা মানবে না- তখনই ছয়-দফা পরিণত হবে এক দফায়। এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতা। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে জাতির সামনে পেশ করা মুজিবের ছয়-দফা ৪ বছরের মাথায় এক দফায় পরিণত হয়। আর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এটাই মুজিবের দূরদর্শিতা, এটাই মুজিব নেতৃত্বের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

১৯৬৬ সালে যখন শেখ মুজিব ছয়-দফা দাবি পেশ করেন, শেখ মুজিবের বয়স তখন ৪৬ বছর। তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, ঐ সময় কিছু বড় নেতা আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে গেছেন। ছয়-দফাকে কেন্দ্র করেও কয়েকজন প্রথম সারির নেতা আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে যায়। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তিনি ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে ছয়-দফা পেশ করেন। আওয়ামী লীগের প্রথম সারির সকল নেতা এমনকি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) ও দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীকেও গ্রেফতার করে মোনায়েম চক্র।

সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদকে গ্রেফতারের পর সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। মিজান চৌধুরীকে গ্রেফতার করার পর মোল্লা জালাল দায়িত্ব নেন। মোল্লা জালাল গ্রেফতার হওয়ার পর মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগমকে আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের পর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম সে-সময় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। এসময় সকল পর্যায়ের নেতাকে গ্রেফতারের পর ১৯৬৬ সালের ৮ মে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় বিশাল জনসভা শেষে গভীর রাতে ৩২ নম্বরের বাসা থেকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ঐ রাতে আরো গ্রেফতার হন তাজউদ্দীন আহমেদ, খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, এম এ আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী), এমএস হক এবং আবদুর রহমান সিদ্দিকী। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় ছয়-দফা বাস্তবায়ন নীতি অব্যাহত রাখা এবং ৭ জুন পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গভর্নর মোনায়েম খান হরতালকে সামনে রেখে গ্রেফতার, নির্যাতন, হয়রানির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ২ জুন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয়, ঢাকা জেলা ও নগর কমিটির বেশ ক'জন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ জুনের হরতাল বানচালের জন্য সরকার সকল পর্যায়ে অঘোষিতভাবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। মানিক মিয়ার ইত্তেফাক ব্যতীত কোনো পত্রিকাই ছয়-দফা কর্মসূচি সমর্থন করেনি। আজকের মতো ঐ সময়ে বিবিসি ও টেলিভিশন চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে হরতালের খবর প্রচারিত হতো না। ৭ জুন হরতাল পালিত হবে- এই খবরটিও ইত্তেফাক ব্যতীত অন্য কোনো পত্রিকা প্রচার করেনি। তবে যেভাবেই হোক ৭ জুনের হরতালের খবর দেশব্যাপী প্রচার হয়ে যায়। সরকারের কঠোর দমননীতির মধ্যেও হরতাল যে সফলভাবে পালিত হলো ঐ খবরও ইত্তেফাক ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়নি। সরকারের পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হরতাল পালনরত জনতাকে বিভিন্ন স্থানে ছত্রভঙ্গ করে। নারায়ণগঞ্জসহ সারাদেশে মনু মিয়া, মজিবুরসহ ১১ জন নিহত, বহু লোক আহত এবং গ্রেফতার হন। শহিদ মনু মিয়ার রক্তে ভেজা গেঞ্জি নিয়ে নুরে আলম সিদ্দিকীসহ আরো অনেকে তাৎক্ষণিকভাবে বিশাল মিছিল বের করেন। মিথ্যায় ভরপুর সরকারি বিজ্ঞপ্তি থেকে ঐদিন টঙ্গী, ঢাকা, আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ, ডেমরা, তেজগাঁওসহ অনেক স্থানে জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষের কথা জানা যায়। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ঐদিন হরতাল সফল করার জন্য বিভিন্ন স্থানে জনতার সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পাকিস্তানের ১৯ বছরের ইতিহাসে ৭ জুনের মতো এমন সরকারবিরোধী সফল হরতাল এর আগে যেমন হয়নি, তেমনি হরতালকে সফল করার জন্য কোনো রাজনৈতিক দলের ডাকে এর আগে কোনো সময় এত সংখ্যক নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ রাজপথে নামেনি।

সরকারি হিসাবে ৭ জনের নিহত হওয়ার কথা বলা হলেও বেসরকারিভাবে হতাহতের সংখ্যা ছিল আরো অনেক বেশি। ৭ জুন এত বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটলেও মওলানা ভাসানীর মতো বড় মাপের একজন রাজনৈতিক নেতা বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দল সরকারের কোনো সমালোচনা করেনি। হরতালের খবরাখবর প্রকাশের ২/৩ দিন সেন্সর বিধি আরোপের বিরুদ্ধে কোনো পত্রিকা বা কোনো দল সমালোচনা করেনি। সরকার এতটাই হিংস্র দমননীতি চালায় যে, বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়ির সড়ক দিয়ে মানুষ চলাচল করতে সাহস পায়নি। তারা আমেনা বেগমের স্বামী মোশাররফ হোসেনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। ছয়-দফা দেয়ার পর থেকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সরকারের দমননীতি, নির্যাতন, ধরপাকড়, হয়রানির ব্যাপারেও মওলানা ভাসানীসহ অন্য কোনো রাজনৈতিক দল নীরব থাকে। তবে রাওয়ালপিন্ডিতে ৮ তারিখে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন এবং ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলাকালে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ ৭ জুন হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও সরকারি দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ জানান। এটা তো ঠিক, ছয়-দফাকে বাংলার মানুষ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। আর এজন্যই শেখ মুজিবসহ নেতৃবৃন্দ জেলে থাকা সত্ত্বেও রাজবন্দিদের মুক্তি ও ছয়-দফার সমর্থনে পূর্ববাংলার মানুষ ৭ জুন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। ছয়-দফাকে কেন্দ্র করে সরকারের দমননীতি ও নির্যাতনের প্রতিবাদ না করে পূর্ববাংলার অন্য রাজনৈতিক দল ও নেতা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর জেলে থেকেই বাংলার মানুষের মুকুটহীন সম্রাট হয়ে যান শেখ মুজিব। এভাবে সরকারি দমননীতির মধ্যেও ছয়-দফার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর সাথে কোনোরকম আপসরফা না করে ষাটের দশকের শেষদিকেই শেখ মুজিব এদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাকে ছাড়িয়ে যান।

কি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ছয়-দফা দিয়েছিলেন এবং কেন তিনি ওই সময়টাই বেছে নিয়েছিলেন? ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করেই ভারত আক্রমণ করে বসে পাকিস্তান। যুদ্ধের ১৭ দিনের মাথায় সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যস্থতায় দু'দেশ তাসখন্দে যুদ্ধবিরতিতে স্বাক্ষর করে। ১৭ দিনের ওই যুদ্ধের পর ৮ বছর ধরে দোর্দন্ড প্রতাপে ক্ষমতায় থাকা কথিত লৌহমানব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা তার প্রধান ঘাঁটি পশ্চিম পাকিস্তানে দারুণভাবে হ্রাস পায়। আইয়ুব খানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা করে রেলযোগে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান সফর করেন। ভুট্টো জনগণকে বোঝাতে থাকলেন যে, আইয়ুব খান না হয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট থাকলে তাসখন্দ চুক্তি করতে হতো না, কাশ্মীরও পাকিস্তানের হয়ে যেত। ওই সময় শেখ মুজিব একটি অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, '১৭ দিনের যুদ্ধে ভারত চাইলে খুব সহজেই পূর্ব পাকিস্তান দখল করতে পারতো। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর নির্বাচন, '৬২-এর ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ১৯৬৫-এর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ নতুন করে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলো, পূর্ব পাকিস্তান থাকুক বা না থাকুক, তাতে পাকিস্তানিদের কিছু যায় আসে না।' নিজের দল আওয়ামী লীগের মধ্যে কিছুটা সমস্যা থাকলেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের চরম দুরবস্থার সময়টায় ছয়-দফা দেয়ার মোক্ষম সময় বলে মনে করলেন সাহসের বরপুত্র, দূরদর্শী শেখ মুজিবুর রহমান।

অনেকের ধারণা, বহু আগে থেকেই ছয়-দফার মতো কর্মসূচি জাতির সামনে দেয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন শেখ মুজিব। পাকিস্তান-ভারতের ১৭ দিনের যুদ্ধকালে পূর্ববাংলার অসহায়ত্ব সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু ওই সময় ছয়-দফা দেয়াটা শেখ মুজিবের জন্য ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। মুজিব জানতেন, পাকিস্তান সরকার, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দল ছয়-দফার বিরোধিতা করবে। এমনকি নিজের

দল আওয়ামী লীগের মধ্য থেকেও বিরোধিতা আসবে। ছয়-দফা দেয়ার আগে সমমনা কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো নেতার সাথে এই নিয়ে আলোচনা করার সুযোগও তখন ছিল না। যেজন্য দলীয়ভাবে কোনো আলোচনা বা সিদ্ধান্ত ছাড়া তাজউদ্দীন আহমদসহ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ নেতাদের সাথে নিয়ে লাহোরে ছয়-দফা দেন শেখ মুজিব। ছয়-দফা দেয়ার পর পাকিস্তান সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার মুখে দলীয়ভাবে না হলেও বিভিন্নভাবে ছয়-দফার পক্ষে জোরালো প্রচার অব্যাহত থাকে। ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় সম্মেলনে ছয়-দফা আলোচ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ওই সম্মেলন থেকে ওয়াকআউট করেন। ওই দিন লাহোরে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিমানবন্দরে শেখ মুজিব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ছয়-দফা দাবি দেয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও গভর্নর মোনায়েম খান ছয়-দফার বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেন।

১৩ মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠকের আগেই পোস্টার, প্লাকার্ডসহ বিভিন্নভাবে ছয়-দফার পক্ষে জোরালো প্রচার অব্যাহত থাকে। শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যে ছয়-দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দলের তরুণ কর্মীরা ছয়-দফার পক্ষে বিভিন্ন পোস্টার ছেপে সারাদেশে বিলি করতে থাকেন। দলের প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমিন ছয়-দফার পুস্তিকা প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় অফিস থেকে বিলি করেন। আমির হোসেন আমুর এক লেখা থেকে জানা যায়, ১৩ মার্চ (১৯৬৬) আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয়-দফা অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে দলের সভাপতি আবদুর রশিদ তর্কবাগীশসহ আরো কয়েকজন বিরোধিতা করেন। আসন্ন দলীয় কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদন নেয়ার শর্তে ওয়ার্কিং কমিটি ছয়-দফা অনুমোদন করে। অবস্থা বেগতিক দেখে অনুমোদনের আগেই সভাপতি সভাস্থল ত্যাগ করলে তাঁর পরিবর্তে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এসময় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের আপত্তি সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কার্যকরী কমিটির সভায় ছয়-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। (গৌরবের ৫৫ বছর- স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৩৯)।

এদিকে ছয়-দফা নিয়ে দলের মধ্যে সৃষ্ট মতবিরোধের নিরসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ১৮ ও ১৯ মার্চ ঢাকার ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কাউন্সিল অধিবেশন শেষে ২০ মার্চ পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় নবনির্বাচিত দলীয় সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'ছয়-দফা বাঙালির মুক্তি সনদ। এটা মূলত আমাদের বাঁচার অধিকারের দাবি। কোনো হুমকিই ছয়-দফা আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। বাঙালি জাতির অস্তিত্বের জন্যই আমরা ছয়-দফা প্রণয়ন করেছি। ছয়-দফা বাঙালি জাতির প্রাণের দাবি হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। ছয়-দফার কথা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন।'

সভায় মাওলানা তর্কবাগীশসহ ছয়-দফাবিরোধীরা সরে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগ পুরোদমে ছয়-দফার সমর্থনে জোরালো প্রচার শুরু করে। আইয়ুব খান, মোনায়েম খান, সরকারের চামচা পিডিএমপন্থীরাসহ মওলানা ভাসানী এবং আরো অনেকেই ছয়-দফার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। ইতিহাসবিদ সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ-এর 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' গ্রন্থে (পৃ. ২১০) মওলানা ভাসানীর একটি জনসভায় দেয়া বক্তব্য রয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৩০ আগস্ট ময়মনসিংহে ন্যাপের এক জনসভায় ভাসানী বলেন, 'ছয়-দফা সিআইএ-র দলিল। ছয়-দফার কোনো অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেই। পরিব মানুষের এতে কোনো উপকার হবে না। আওয়ামী লীগের ভাইয়েরা আর বিভ্রান্ত হবেন না।' (সংবাদ, ৩১ আগস্ট ১৯৬৬)

আসলে শেখ মুজিব ছিলেন জাদুকরী সংগঠক। ২০ মার্চের পর শেখ মুজিব সময় পেয়েছিলেন মাত্র ৫ সপ্তাহ। চারণ কবির মতো ৫ সপ্তাহে সারাবাংলা ঘুরে ছয়-দফাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। সরকারের কঠিন দমননীতির মুখেও আওয়ামী লীগের শক্তিশালী প্রচার ও প্রতিরোধের কারণে ছয়-দফা বাংলার মানুষের একমাত্র দাবিতে পরিণত হয়ে যায়। এদিকে সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে কিছু রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দল ছয়-দফার বিরুদ্ধে মাঠে নামে। ছয়-দফাপন্থী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়। ১৯৬৭ সালের ২০ আগস্ট পিডিএমপন্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান এডহক আওয়ামী লীগের অনুমোদন প্রদান করে। পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ আট-দফা দাবি ঘোষণা করে, কিন্তু জনগণের কোনো সাড়া মেলেনি। তখন মওলানা ভাসানীর ছয়-দফার বিরোধিতা ও পাকিস্তান সরকারকে সমর্থনকে কেন্দ্র করে ভাসানী ন্যাপও ভেঙে যায়। ১৯৬৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় ন্যাপ রিকুইজিশনপন্থীদের সভায় স্লোগান দেয়া হয়- 'ভাসানী আইয়ুব খানের দালাল'। সভায় মহিউদ্দিন আহমদ এক লিখিত বক্তৃতায় দলের ভাসানীপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তারা সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। একই বক্তৃতায় ৭ জুনের পরবর্তী আন্দোলনে অংশ না নেয়ায় ভাসানীপন্থীদের 'বিশ্বাসঘাতক' বলে উল্লেখ করেন তিনি। (শ্যামলী ঘোষের 'আওয়ামী লীগ ১৯৪৭-১৯৭১', পৃ. ১৫৬)।

মনে রাখতে হবে, ছয়-দফা আন্দোলনে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, সাংবাদিক জগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। ছয়-দফার ব্যাপারে মানিক মিয়া প্রথমদিকে কিছুটা নীরব থাকলেও সহসাই ছয়-দফার সমর্থনে কলম ধরলেন। জনগণের বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় এবং দাবির সমর্থনে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ জোরালো যুক্তির মাধ্যমে মানিক মিয়া ছয়-দফাকে অতিদ্রুত বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। মিজান চৌধুরীর ভাষায়- মানিক মিয়া 'ছয়-দফাকে এমনভাবে সমর্থন দিতে শুরু করলেন যেন ছয়-দফা তাঁরই সৃষ্ট।' সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদের গ্রন্থ (পৃ. ২০৯) অনুযায়ী আইয়ুব-মোনায়েমের নির্দেশে পুলিশ ১৫ জুন পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন ৩২(১)খ ধারা অনুসারে মানিক মিয়াকে ১৫ জুন ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে এবং ১৬ জুন ইত্তেফাক নিষিদ্ধ এবং নিউজপ্রিন্ট প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। আমি জানি না- এই বিশ্বজগতে আর কোনো সাংবাদিক ও কলামিস্ট জনগণের পক্ষে কলম ধরে মানিক মিয়ার মতো বারবার কারাবরণ ও নির্যাতন ভোগ করেছেন

কিনা। বাঙালি জাতির ইতিহাসে মানিক মিয়া অমর হয়ে থাকবেন।

ছয়-দফা যে স্বাধীনতা এনে দিবে এবং স্বাধীনতাই যে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য- একথা বঙ্গবন্ধু নিজেও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন। মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে (৮৭ পৃ.) লিখেছেন, ছয়-দফা আন্দোলন চলাকালে ছয়-দফার প্রশ্নে একটা আপোসের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পুত্র গওহর আইয়ুব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাংবাদিক জেড এ সুলেরী ঢাকা এসে আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে অতিশয় গোপনে দেন-দরবার শুরু করেন। ওরা দুজন খন্দকার মোশতাকের সাথে কারাগারে গোপন বৈঠকে আপোসরফার একটা খসড়া তৈরি করেন। ওই খসড়া নিয়ে শেখ মুজিবের মতামত নেয়ার জন্য মিজান চৌধুরী ও শাহ মোয়াজ্জেমকে দায়িত্ব দেয়া হয়। একদিন নির্জন দুপুরে দুই নেতা বঙ্গবন্ধুর সেলে প্রবেশ করে খসড়াটি দেখান। তিনি মনোযোগের সঙ্গে সেটা পাঠ করে জবাব দেন- 'এ ধরনের আপোস করলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দূরের কথা- ছয়-দফাও আদায় হবে না।' একথা থেকে প্রমাণিত হয়, শেখ মুজিবের স্থির বিশ্বাস ছিল, যত বিরোধিতাই আসুক, শেষ পর্যন্ত ছয়-দফা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে কত বড় সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী নেতা ছিলেন, এর একটা উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৬৮ সালের ২০ জুন সেনানিবাস এলাকার বিচারকক্ষে আগরতলা মামলার সওয়াল-জওয়াব চলছে। বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টারদের মধ্যে প্রখ্যাত সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ বঙ্গবন্ধুর খুব কাছাকাছি বসা ছিলেন। শেখ মুজিব ডাক দিলেন- 'ফয়েজ, ফয়েজ, এই ফয়েজ।' ভয়ে ফয়েজ আহমদ কথা বলছেন না। ফয়েজ আহমদ তার গ্রন্থে লিখেছেন: "...অন্যদিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বললাম, 'মুজিব ভাই, কথা বলা মানা। মাথা ঘোরাতে পারছি না। বের করে দেবে।' তক্ষুণি উত্তর আসলো যথেষ্ট উচ্চকণ্ঠে, 'ফয়েজ, বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলতে হবে।' তার এই কথা ছিল রাজনৈতিক ও প্রতীকধর্মী। স্তম্ভিত কোর্ট, সমস্ত আইনজীবী

ও দর্শকগণসহ সরকারি অফিসাররা তার এই সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। প্রধান বিচারপতি একবার ডানদিকে ঘাড় বাঁকা করে শেখ মুজিব ও অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকালেন। কিছুই বললেন না। কোনো সতর্ক উচ্চারণ ছিল না। তিনি হয়তো কোর্টের আভিজাত্যবোধ থেকে এই দৃষ্টিপাতকেই যথেষ্ট সতর্কতা প্রদান বলেই মনে করেছিলেন এবং বোধহয় নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে, শেখ মুজিব এমন কারাগার, ভয়ভীতি, শংকা ও ট্রাইব্যুনালের বিচারের মধ্যেও শেখ মুজিবই রয়ে গেছেন। তবে কিসের সমর্থনে শেখ মুজিবের এই মনোবল, তা তিনি এমন সুউচ্চ অবস্থান থেকে অনুমান করতে পারেননি। তখন তিনি জানতেন না যে, শেখ মুজিবের এই প্রতীকী উচ্চারণ একজনের জন্য নয়, সমগ্র দেশের জনগণের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলনের বাণীস্বরূপ।" (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাঃ শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ১৬-১৭)।

১৭ ফেব্রুয়ারি পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগ অফিসে সংবাদ সম্মেলনে ছয়-দফার বিষয়বস্তুর উপর বিশদ ব্যাখ্যা দেন শেখ মুজিব। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয়-দফার সামগ্রিক প্রস্তাবনামা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন লাভ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ছয়-দফা দলের ইশতেহারে পরিণত হয়। ১৬ মার্চ রাজশাহীতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছয়-দফার তীব্র সমালোচনা করে বলেন- 'ইহা স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই একটি পরিকল্পনা।' এ কাজ তিনি কখনোই সফল হতে দিবেন না বলে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। এরপর ঢাকায় মুসলিম লীগের কনভেনশনের সমাপ্তি অধিবেশনে আইয়ুব খান শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করে গৃহযুদ্ধেরও হুমকি দেন। শেখ মুজিব যেখানেই জনসভা করেন, সেখানেই তিনি গ্রেফতার হন। জামিন পেয়ে জনসভা করলে আবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মোনায়েম খান ঘোষণা করেন, তিনি যতদিন গভর্নর থাকবেন, ততদিন শেখ মুজিবকে জেলেই থাকতে হবে। আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মী দিয়ে পূর্ববাংলার সকল জেলখানা পূর্ণ করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর ছাত্রলীগ ছয়-দফা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকে। মজহারুল বাকি, আবদুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকীসহ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ছয়-দফার সমর্থনে সারাদেশে সভা-সমাবেশ করেন। ছাত্রলীগ নেতাদেরও গ্রেফতার করা হয়। সরকারি নির্যাতন, নিপীড়ন যত বাড়তে থাকে, আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের প্রতি জনসমর্থন ততই বৃদ্ধি পায়। সমগ্র পূর্ববাংলা তখন কারাগারে পরিণত হয়। জনগণ উপলব্ধি করেন, তাদের পক্ষে কথা বলার একমাত্র নেতা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান। এভাবে হাজার হাজার নেতাকর্মীসহ বছরের পর বছর জেলে থেকেই শেখ মুজিব জনগণমন অধিনায়ক হয়ে যান। আইয়ুব-মোনায়েম চক্র বুঝে গেল, শেখ মুজিব বেঁচে থাকলে পাকিস্তানও ভাঙবে এবং তাদের রাজনীতিও শেষ হয়ে যাবে। এসময় শেখ মুজিবকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত করে

আইয়ুব-মোনায়েম চক্র।

শেখ মুজিবসহ ৩২ জনকে আসামী করে ১৯৬৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নামে বিচার শুরু হয়। আইয়ুব গংদের ষড়যন্ত্র মামলার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল 'শেখ মুজিব ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন করতে চাচ্ছে'- এই অভিযোগ এনে তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিত্রিত করে ফাঁসিতে হত্যা করা। বঙ্গবন্ধু শুরুতেই এই মামলাকে 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা' বলে আখ্যায়িত করেন। সেনানিবাসে গোপনীয়তার মাধ্যমে মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হলে ফল দাঁড়ালো উল্টো। প্রতিদিন সওয়াল জওয়াবের খবর প্রচারে ছয়-দফা দাবি ব্যাপক প্রচার পায়। একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে গত দুই দশক জুলুম করা হয়েছে, তাও উঠে আসে। ছয়-দফার ব্যাপারে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, পূর্ববাংলার ন্যায্য পাওনা ও দাবি-দাওয়ার কথা বলার কারণেই আইয়ুব-মোনায়েমরা মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে হত্যা করতে চাচ্ছে। ফলে শেখ মুজিব বাংলার মানুষের কাছে অবিসংবাদিত নেতা এবং জাতীয় বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ববাংলায় গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

১৯৬৮ সালের ৪ জুলাই আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় ওই প্রহসনের বিচারের বিরুদ্ধে ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের ওপর ৪ বছর ধরে ক্রমাগত নির্যাতনে বাংলার মানুষ ফুঁসে ওঠে। শেখ মুজিবের মুক্তিসহ ১১ দফা দাবি নিয়ে ঢাকায় ছাত্রসমাজ আন্দোলন শুরু করে। রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনে ছাত্রদের আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। আন্দোলনের কাছে সরকার নতি স্বীকার করে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ অন্য নেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম ছাত্র জনসভায় বাংলার জননন্দিত নেতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিছুদিনের মধ্যে আইয়ুবের পতন হয়। ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আইয়ুব খান সরে যেতে বাধ্য হন। বঙ্গবন্ধু ওই নির্বাচনকে ছয়-দফার পক্ষে গণভোট বলে আখ্যায়িত করেন। ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৩১৩ (৩০০+১৩) আসনের পার্লামেন্টে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৬৯ (১৬২+৭) আসনের মধ্যে ২টি বাদে ১৬৭ (১৬০+৭) আসন পেয়ে সারা পাকিস্তানে সংখ্যাপরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে বঙ্গবন্ধু দল আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসন পায়।

আসলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মওলানা ভাসানীসহ সকল নেতাকে ছাড়িয়ে শেখ মুজিব বাঙালির একমাত্র নেতায় পরিণত হন। সত্তরের নির্বাচনে বাঙালি জাতি বিশ্বকে জানিয়ে দিল- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছাড়া তাদের আর কোনো নেতা নেই। ভুলে গেলে চলবে না, দেশ ও জাতির কি কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে ছয়-দফা পেশ করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি তর্কবাগীশসহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতার সমর্থন নেই জেলেও মুজিব সেদিন ছয়-দফা নিয়ে জাতির সামনে হাজির হন। আর ১৯৬৬-তে ছয়-দফা দিয়েছিলেন বলেই একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত সত্য যে, পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তরুণ বয়সেই শেখ মুজিব স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জীবনে কোনোদিন 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। তিনি বলতেন 'পূর্ববাংলা'। ১৯৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর তিনিই এই পূর্ববাংলার নামকরণ করেন বাংলাদেশ। নিজ বাসভবনে খাওয়ার টেবিলে ও ঘরোয়া আলোচনায় বলতেন, এই দেশটি কোনোদিন স্বাধীন হলে কবিগুরুর আমার সোনার বাংলা গানকে জাতীয় সংগীত করা হবে। ১৯৭০ সালের জুনেই ঢাকাস্থ মার্কিন কূটনীতিক আর্চার ব্লাডকে শেখ মুজিব বলেন, 'I will proclaim independence and call for guerill action if the army tries to stop me.'। অর্থাৎ 'সামরিক বাহিনী যদি আমাকে বাধা দেয় তাহলে আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করবো এবং গেরিলা যুদ্ধের ডাক দেবো।' ১৯৬৯-এর ৭ নভেম্বর পাকিস্তানে আমেরিকান দূতাবাসের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়, 'He is in effect uncrowned king of East Pakistan'। অর্থাৎ 'মুজিব প্রকৃতপক্ষেই পূর্ব পাকিস্তানের মুকুটহীন সম্রাট।'

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর শেখ মুজিব বিশ্বনেতায় পরিণত হন। সেসময় লন্ডনে ভারতীয় কূটনীতিক ভেদমারওয়া বলেছেন, '১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির পর বিশ্বে শেখ মুজিব ছিলেন সবার ওপরে। তখন তাঁর মতো আলোচিত নেতা দ্বিতীয়জন ছিল না। লন্ডন-আমেরিকার বড় বড় পত্রিকার প্রথম শিরোনাম ছিলেন শেখ মুজিব।' বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে বৃটেনের প্রভাবশালী পত্রিকা গার্ডিয়ান এক সম্পাদকীয়তে লিখে, 'শেখ মুজিবের মুক্তি বাংলাদেশকে বাঁচার সুযোগ করে দিয়েছে। শত্রুর কারাগারে বন্দি, কিন্তু তাঁর নামে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন এবং কোনোরূপ পণ বা প্রতিশ্রুতি না দিয়ে শত্রু সেই মহানায়ককে সসম্মানে মুক্তির ঘটনা বিশ্বে শুধু একটিই।' কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিশেষজ্ঞ সত্যরঞ্জন সরকার তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'শেখ মুজিব ছিলেন একজন সাধারণ বাঙালি নেতা। কিন্তু এই সাধারণ মানুষটি সেদিন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সারাবিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছিলেন। একবাক্যে সেদিন সারাবিশ্ব মুজিবকে চিনত। বাংলাদেশের বাউল গায়ক থেকে লন্ডন, নিউইয়র্কের বিটল গায়কের কণ্ঠে সেদিন যে গান বেজেছিল তা ছিল মুজিবের বাংলার গান। মুজিব সেদিন বাংলার ইতিহাসই ছিলেন না, ছিলেন বাংলার মানচিত্র। বাংলাদেশ থেকে মুজিবকে কিংবা মুজিব থেকে বাংলাদেশকে আলাদা করে ভাবা আজও অসম্ভব।

সবশেষে, ছয়-দফা শুধু স্বাধীনতা এনে দেয়নি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দলীয় নেতা থেকে জাতীয় নেতা এবং জাতীয় নেতা থেকে রাষ্ট্রপিতা বানিয়েছে।

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা, একাত্তরে দাউদকান্দি থানা মুজিব বাহিনীর অধিনায়ক, সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা সম্পাদক

বাংলা সাহিত্য ও বর্ষা ঋতু

জায়েদুল আলম

> বর্ষায় কবি যেন নেচে ওঠেন ময়ূরীর মতো। কবি যেন পেখম মেলে লিখতে বসেন বর্ষার বৃষ্টি, মেঘ, আলো, অন্ধকার, জল, কাদা, মেঠোপথ, নদীর থৈ থৈ, নৌকোর ঘাট, বাড়ন্ত জল, মৃদু মৃদু ঢেউ। বাংলার কবি যেন বর্ষার আবেশ পেলে যুগের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন অদম্য এক যৌবনে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে প্রতিটি অনুক্ষণ ধারণ করেন মনের কোণে কোণে। দৃষ্টির কোটরে। তারপর শব্দে বাক্যে পয়ারে- নানা ছন্দ তালে- রূপ-রস-গন্ধ মিলিয়ে ব্যক্ত করেন দৃষ্টিগত রূপের বৈচিত্র্য। বর্ষার রূপ যেন কবিকে মাতিয়ে তোলে শব্দের এক অনন্য নৃত্যকলায়।

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ষড়ঋতুর প্রকৃতি তার বিচিত্র স্বভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে শিল্পরসিক মানুষকে অভিভূত করে। ঋতু পরিবর্তনের চিরায়ত ধারায় আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাস আমাদের বর্ষাকাল। বর্ষাকালে আকাশ থাকে গুরুগম্ভীর কালোমেঘের ভারে নিরন্তর অবনত। মেঘ বর্ষণের বিপুল দাপট চলে এইসময়। বাংলাসাহিত্যে ষড়ঋতুর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বহুদূর-সঞ্চারী। বাংলা কবিতায় এই বর্ষা ঋতুর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বর্ষার চরিত্র বা সৌন্দর্যের যে বৈচিত্র্য তা অন্য পাঁচটি ঋতু থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র বর্ষা ঋতুকে নিয়ে কবিদের কবিতায় বর্ষার রূপ বা সৌন্দর্য ধরা দিয়েছে নানান অভিপ্রায়ে। বর্ষার রূপ-বৈচিত্র্য বা সৌন্দর্যবোধ নানাভাবে কবিরা তাদের কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

বর্ষা ঘিরে এ সুধা রচনার আনন্দ থেকে ফিরে থাকতে পারেননি আদিযুগ থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক, আধুনিক থেকে

বর্তমান সময়ের কোনো কবিই। সব যুগে সবসময়ে বর্ষা তার অপরূপ রূপের ছবি চিত্রিত করেছে সকল প্রেমিক কবির মনে। আমাদের বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধ্যযুগের অনেক কবির কবিতায় বর্ষার বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কবি কালিদাস, জয়দেব এর কবিতায় বর্ষার সন্ধান মেলে। তাছাড়া কবি বড়ু চন্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে, কবি বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, রায়শেখর, মনোহর দাস, বাসুদেব ঘোষ এদের প্রত্যেকের বৈষ্ণব পদাবলীতেও বর্ষার বর্ণনা রয়েছে। যেখানে দেখা যায় যে, তারা প্রত্যেকেই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের যে অনুরাগ সেই অনুরাগের গভীরতাকে প্রকাশ করেছেন বর্ষার বিভিন্ন রূপ-বৈচিত্রের বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। এছাড়াও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, খনার বচন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, অক্ষয় কুমার বড়াল, প্রমুখের কবিতায় বর্ষার সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের হাত ধরেই বাংলা কবিতায় বর্ষার বিচিত্র রূপ বা সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। কবিদের বেলায় শুধু নয়, বর্ষার আবেদন আমাদের জীবনেও নানামুখী। যে আবেদন আমাদের মধ্যযুগের বাংলা কবিতা ও সমসাময়িক কবিদের কবিতায় অনুরণিত। চন্ডিদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস কিংবা কালিদাসের কবিতায় বর্ষা সমার্থক হয়েওঠে। তারা তাই বর্ষাকে কবিতার, কবিতাকে বর্ষার পরিপূরক করে তুলেছেন, তাদের কবিতায় বিভিন্ন কাব্যিক ব্যঞ্জনা অনুপ্রাস ও দ্যোতনায়। বর্ষা এলেই মানুষ ভালোবাসার অজানিত এক আহ্বানে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাই অনেকেই বর্ষাকে ভালোবাসার ঋতু হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। কেউ কেউ আবার বলেন বর্ষা নয় বসন্তই হলো প্রেমের ঋতু। তবে এ বিতর্কে সামিল না হয়ে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বর্ষাকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাববাদী মানুষ প্রেমের ঋতু হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। কেননা, এ ঋতুতেই প্রকৃতিতে লাস্যময়তার সাথে সাথে মানবমনেও প্রেমের জোয়ার আনে। সেই জোয়ারে ভাসতে ভাসতেই কবিরা তাদের বিভিন্ন কবিতায় প্রকাশ করে থাকেন প্রেমের বিবিধ ব্যাকুলতা। তাই বর্ষা কখনও অবিমিশ্র প্রেমের অনুঘটক, কখনো কামনা-বাসনা আকুলতার সরব ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যেই বর্ষা গান ও পদ্যসাহিত্যে গরজিত মেঘ হলেও কবিতায় বর্ষা ধরা দেয় পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিতে, বিভিন্ন ব্যঞ্জনা ও গুঢ়ার্থে।

কবি কালিদাস বর্ষাকে অনুভব করেছেন অনুরাগের গভীরতায়। কালিদাসের দৃষ্টিতে বর্ষার সৌন্দর্য-সখা যে মেঘ, সেই মেঘকে কবি লোভনীয় সম্ভোগের আভাস দিয়ে যক্ষের সহচররূপে যক্ষপ্রেমিকার কাছে পাঠান। সেখানে মেঘ সঙ্গত কারণেই প্রেমের বার্তাবহ দূতরূপে চিহ্নিত হয়। মেঘের সঙ্গে প্রেম আর বিরহের একটা অনড় সম্বন্ধ পাতিয়ে কালিদাস তাঁর কবিতায় এক অনবদ্য চিত্রকল্প তৈরি করেছেন। কালিদাসের কবিতার অনুবাদের কিছু অংশ, যেমন- 'কেমনে প্রিয়তমা রাখবে প্রাণ তার অদূরে উদ্যত শ্রাবণে/ যদি- না জল ধরে বাহন করে আমি পাঠাই মঙ্গল বার্তা?/ যক্ষ অতএব কুড়চি ফুল দিয়ে সাজিয়ে প্রণয়ের অর্ঘ্য/ স্বাগত-স্বভাষ জানালে মেঘবরে মোহন, প্রীতিময় বচনে।' এভাবেই কালিদাসের মেঘদূত কবিতায় রাম গিরিপর্বতের ওপারে নির্বাসিত শূন্য ও একাকীত্ব জীবনে মেঘ যখন উঁচুগিরির উপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে যেত; তখন বিরহী যক্ষের মনে জাগত প্রিয়া-বিরহের যাতনা। তাই তিনি বিশদ ব্যাকুলতা বর্ণনা করে মেঘকে দূত করে পাঠাতেন প্রিয়ার কাছে।

মধ্যযুগের কবিতায় বর্ষা এসেছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের ইন্দ হিসাবে। মধ্যযুগের কবিরা বর্ষাকে অভিসার ও বিরহ পর্বে প্রেমবহ্নিতে ঘৃতের ছিটার হিসাবে কল্পনা করেছেন। একই ধারায় চন্ডিদাস তাঁর প্রেমবিরহকাতরতার কথা প্রকাশ করেন তাঁর কবিতায়- 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা/কেমনে আইল বাটে/আঙ্গিনার মাঝে বধূয়া তিজিছে/দেখিয়া পরান ফাটে।'
আর বিদ্যাপতির রচনায়ও বর্ষার বিরহকাতরতা কম নয়- 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর/ এ ভরা বাদর মাহ বাদর/ শূন্য মন্দির মোর।'

বর্ষায় কবি যেন নেচে ওঠেন ময়ূরীর মতো। কবি যেন পেখম মেলে লিখতে বসেন বর্ষার বৃষ্টি, মেঘ, আলো, অন্ধকার, জল, কাদা, মেঠোপথ, নদীর থৈ থৈ, নৌকোর ঘাটি, বাড়ন্ত জল, মৃদু মৃদু ঢেউ। বাংলার কবি যেন বর্ষার আবেশ পেলে যুগের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠেন অদম্য এক যৌবনে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জেগে প্রতিটি অনুক্ষণ ধারণ করেন মনের কোণে কোণে। দৃষ্টির কোটরে। তারপর শব্দে বাক্যে পয়ারে- নানা ছন্দ তালে- রূপ-রস-গন্ধ মিলিয়ে ব্যক্ত করেন দৃষ্টিগত রূপের বৈচিত্র্য। বর্ষার রূপ যেন কবিকে মাতিয়ে তোলে শব্দের এক অনন্য নৃত্যকলায়।
বর্ষা তার রিনিঝিনি শব্দে প্রকৃতির মনকে কখনো আনন্দে সিক্ত করে, কখনো বেদনারিক্ত করে আবার কখনো বিরহকাতরতায় মূক করে তোলে অনায়াসে। প্রকৃতির সে ভাব কবি অবলোকন করেন একচোখে, তারপর সে ভাব ভর করে কবির সরল মানসপটে। সেখান থেকে কবি তা তুলে আনেন কলমের কালিতে। প্রকৃতি কবিকে যেভাবে প্রেরণ করে তার গদ্ধ কবি সেভাবেই তা ছড়িয়ে দেন কালো অক্ষরে। আনন্দ যেন আর ধরে না। কবি এবেলা বৃষ্টির ফুল কুড়ান তো ওবেলা মেঘের মালা গাঁথেন। ওবেলা মেঘের মালা তো পরের বেলা ঝড়ের তোড়ে ছিন্নমালার বেদনায় নীল হয়ে কুঁকড়ে হাঁটেন। সামান্য পরই আবার উঁকি দেওয়া সূর্য কবিকে নিয়ে চলে যায় বিলের কাছে, বিলের কাছে, ঘাটের কাছে, গ্রাম্য বধূয়ার কলসির কাছে, কবি যেন সেরূপে বিমোহিত হয়ে ফেটে পড়েন অট্টহাস্যে, ভুলে যান ঘরদোর, বিগত বেদনার লেনদেন। আর তাকেই উপমা করে কবি রচনা করে মনের অমৃতসুধা। আর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় দেখা যায়, তিনি বর্ষাকে কল্পনা করেছেন প্রকৃতির অরূপ শক্তি হিসাবে। তাঁর কবিতায় বর্ষার প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যার সাথে একাত্ম ঘোষণা করেছেন দেবতাগণও। মধুসূদন দত্তের বর্ষাকাল কবিতায় বর্ষার রূপকল্প বর্ণনা হয়েছে এভাবে- 'গম্ভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,/ উথলিল নদনদী ধরণীর উপর।/ রমণী রমন লয়ে, সুখে কেলি করে,/ দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।'

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনিও বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। বর্ষার চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রাবণ মাসকে দেখেছেন ঘন ঘোর বর্ষণের মাস হিসেবে। তাঁর দৃষ্টিতে বর্ষা-চরিত্রের ভাবটি তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে-
সখি, নব শ্রাবণ মাস/ জলদ-ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা/ ঝুপঝুপ ঝরিছে আকাশ।/ ঝিমকি ঝমঝম, নিনাদ মনোরম,/ মুহুমুহু দামিনী-আভাস। পবনে বহে মাতি,/ তুহিন-কণাভাতি দিকে দিকে রজত উচ্ছাস।

বর্ষার আরেক কবি অক্ষয় কুমার বড়াল।

তিনি কবিতায় বর্ষায় গ্রামবাংলার প্রকৃতির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। যেখানে কবি স্বভাবের সৌন্দর্য প্রকৃতির মতোই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতাটির কয়েকটি লাইন- 'দীঘিটি গিয়াছে ভরে, সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,/ কানায় কানায় কাঁপে জল;/ বৃষ্টি-ভরে বায়ু-ভরে নুয়ে পড়ে বারেবারে/ আধফোটা কুমুদকমল।/ তীরে নারিকেল-মূলে থল-থল করে জল,/ ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে;/ সারি দিয়ে মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,/ লুকাইছে কভু দাম-ঝাঁকে।/ ক্বচিত অশ্বথ-তলে ভিজিছে একটি গাভী,/ টোকা মাথে যায় কোন চাষী;/ ক্বচিত মেঘের কোলে, মুমূর্ষুর হাসিসম,/ চমকিছে বিজলীর হাসি। অক্ষয় কুমার বড়ালের এ কবিতাটি এক অর্থে বর্ষায় পল্লিবাংলার এক অপরূপ রূপের বর্ণনা।

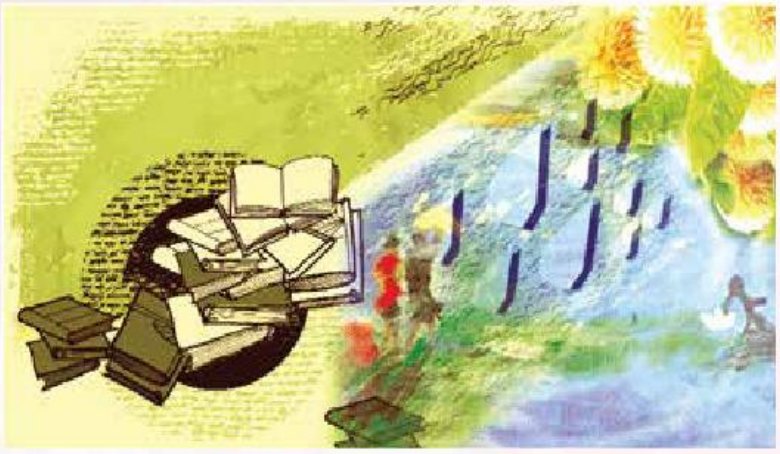

মধ্যযুগের কবিতায় কবিদের বর্ষা নিয়ে ভাবনার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সময়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেইসময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও বর্ষার বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ হতে দেখা যায়। কেননা রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা ছিলো ষড়ঋতুর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায় বর্ষাকে উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে। তিনিই যেনো কবিতার মাধ্যমে বর্ষাকে পূর্ণতা দিলেন। তাঁর কবিতায় বর্ষার বিচিত্র রূপ প্রকাশ পায় বর্ষাবন্দনা রূপে। বর্ষার ঘনকালো মেঘ আকাশকে ঢেকে দিয়ে গুরুগুরু গর্জনে যখন নেমে আসে বৃষ্টির অবিরাম ধারা; সে বৃষ্টির ধারা তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যায় শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিময় দিনগুলোতে। তাই তাঁর কবিতার শরীরে চোখ বুলালে জেগে ওঠে প্রেমের উদ্রেক। রবীন্দ্রনাথের বহু জনপ্রিয় কবিতার মধ্যে অন্যতম বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর যা বর্ষার দিনে কবিমনকে সিক্ত করে অতীত রোমন্থনে। তাই বুঝি বৃষ্টি এলেই দুরন্ত শৈশব তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, আর কবি আক্রান্ত হন নস্টালজিয়ায়; তখনই তাঁর কবিতায় ঝরে পড়ে স্মৃতিকাতরতার বৃষ্টি- 'কবে বৃষ্টি পড়েছিল, বান এলো যে কোথা/ শিবঠাকুরের বিয়ে হলো কবেকার সে কথা।/ সেদিনও কি এমনি তরো মেঘের ঘনঘটা/ থেকে থেকে বাজবিজুলি দিচ্ছিল কি হানা।' রবীন্দ্রনাথ মূলত বর্ষাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন পূর্ববঙ্গে এসে ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সালে পূর্ববঙ্গে জমিদারি দেখাশোনা

করার সময়। বর্ষার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের চিরন্তন বিরহ-বেদনার কষ্ট অনুভব করেছেন। তাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষা কখনো নবযৌবনের প্রতীক, কখনো বিরহকাতর হৃদয়ের দহন-জ্বালার প্রকাশ হিসেবে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে বিশেষ শিল্পদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন- যা তাঁর বর্ষামঙ্গল কবিতায় সেই কাব্যভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের হৃদয়জুড়ে বর্ষা যে একটি আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে একথা বলা যায়। কবি বর্ষার আগমনে পুলকিত হয়ে আনন্দের নির্যাসটুকু প্রকৃতির মধ্যে ঢেলে দিয়ে বর্ষাকে অভিবাদন করেছেন- 'এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,/ গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা-/ দুলিছে পবন সনসন বন বীথিকা,/ গীতময় তরুলতিকা।'

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থে বর্ষার দিন শিরোনামের বর্ষা নিয়ে একটি কবিতা রয়েছে। বর্ষা এলেই কবিকে তাড়িত করে অন্য এক আবেগ। বৃষ্টির নির্ঝরণীতে অধিক যেনো ব্যাকুল হয়ে ওঠে আবেগতাড়িত কবিমন। জীবন, জীবনের বন্ধন, জগৎ সংসারের পিছুটান তখন কবির কাছে গৌণ হয়ে ওঠে। অঝোরধারার বৃষ্টি কবির কাছে প্রেমিকার কান্না বলে মনে হয়। তাই কবি বর্ষার নির্ঝরণীতে ধুয়েমুছে দিতে চান যাবতীয় দুঃখ, যাতনা, বিষাদময় ক্লেদাক্ততা। এইজন্যেই হয়তো কবি তাঁর বর্ষামঙ্গল কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন এতো কাব্যব্যঞ্জনা। বর্ষার ঘনঘটায় কবি রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ আনন্দ বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ষাকে আর একবাঁকে দেখেননি। বহুবাঁকে বহুপাকে বর্ষা দেখেছেন তিনি। উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে। রবীন্দ্রনাথই যেন কবিতার মাধ্যমে বর্ষাকে পূর্ণতা দিলেন। তাই তাঁর কবিতায় বর্ষার বিচিত্র রূপপ্রকাশ পায় বন্দনারূপে। আকাশ ঘনকালো করে গুরুগুরু গর্জনে বৃষ্টির অবিরাম ধারা নেমে এলে কবি যেন ফিরে যান তাঁর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলোতে। তখনই তাঁর কবিতায় (বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর) ঝরে পড়ে স্মৃতিকাতরতার বৃষ্টি: 'বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে/ ছেলেবেলার গান/ বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর/ নদে এল বান।' আবার তিনি এ বর্ষাকেই বেছে নিয়েছেন প্রেমিকাকে প্রেম সম্বোধনের উত্তম সময় হিসেবে। বর্ষার বারিধারায় অধিক ব্যাকুল হয়ে আবেগতাড়িত কবি-মন (বর্ষার দিনে কবিতায়) বলেছেন: 'এমন দিনে তারে বলা যায়/ এমন ঘন ঘোর বরিষায়-/ এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে/ তপনহীন ঘন তমসায়।' বর্ষার ঘনঘটায় কবি রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছেন। বৃষ্টি দেখে তিনি যেমন পুলকিত হয়েছেন তেমনি মেঘের ঘনঘোর দেখে শঙ্কিত হয়েছেন। একারণেই রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বর্ষা ফিরে এসেছে বারবার- বহু কবিতায় বিভিন্ন আঙ্গিকে, সৌন্দর্যে-সৌকর্যে। তাই অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে বর্ষার কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

আমাদের বিদ্রোহী কবি একই সাথে প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলাম। প্রকৃতির নানামুখী ব্যঞ্জনায় নিজেকে সন্ধান করেছেন। কবিত্বের শিল্পসুন্দর মাধুর্য কবির কাব্যানুভূতি উৎসারিত হয়েছে। নজরুল

অন্যান্য কবিদের মতো তার শিল্পচৈতন্যে ও বর্ষা ঋতুর প্রভাবকে উপস্থাপন করেছেন। নজরুল যে, অনন্তবিরহের কবি, তা তাঁর বর্ষার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। বর্ষার সম্মোহনরূপের প্রভাবে মানব-হৃদয়ে স্থিরসঙ্গহীনতার বেদনা ঘনীভূত হয়, সেইদিকটি তিনি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবিতার কয়েকটি লাইন- 'অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে সঘন তিমির রাতে।/ নিদ্রা নাহি তোমার চাহি আমার নয়ন-পাতে।।/ ভেজামাটির গন্ধ সনে/ তোমার স্মৃতি আনে মনে,/ বাদলি হাওয়ায় লুটিয়ে কাঁদে আঁধার আঙিনাতে।।' নজরুলের কবিতায়, প্রকৃতপক্ষে বর্ষা ঋতু হচ্ছে বিরহের ঋতু। তাঁর কবিতায়ও বর্ষা ধরা দিয়েছে বিভিন্ন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। বর্ষার মেঘ তাঁর বিরহ-বেদনাকে আরো বেশি উসকে দিয়েছে। যা কবির বাদল রাতের কবিতায় মূর্ত হয়ে ওঠে- 'বাদল রাতের পাখী/ উড়ে চল যেথা আজো ঝরে জল,/ নাহিক ফুলের ফাঁকি।' তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে বাদল রাতের পাখিকে বন্ধু ভেবে তার বিরহের সাথে নিজের বিরহ একাকার করতে চেয়েছেন। তিনি বর্ষাকে ভেবেছেন তাঁর দুঃখ-যাতনার সারথি হিসাবে। সেকারণেই হয়তো বর্ষা বিদায় কবিতায় কবি মনের যত আকুতি ঝরে পড়ে- 'যেথা যাও তব মুখর পায়ের বরষা-নূপুর খুলি'/ চলিতে চলিতে চমকি' উঠ না কবরী ওঠে না দুলি/ সেথা রবে তুমি ধেয়ান-মগ্ন তাপসিদী অচপল./ তোমায় আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি 'ফটিক-জল'।

পল্লিকবি জসীম উদ্‌দীন বর্ষা নিয়ে অনবদ্য কবিতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অনবদ্য কবিতা- পল্লী-বর্ষা। জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় বর্ষা এসেছে আরেক রকম ব্যঞ্জনা হয়ে। তিনি উদাস হয়ে দেখেছেন বর্ষার রূপ। সেরূপে এমনই ব্যাকুল হয়েছেন যে তিনি কোনো পথ আর খুঁজে পান না, সব পথই আনন্দে ভরপুর: 'আজিকে বাহিরে শুধু ক্রন্দন ছলছল জলধারে/ বেণু-বনে বায়ু নাড়ে এলোকেশ, মন যেন চায় কারে।'

পল্লী-বর্ষা কবিতায় কবি বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণমুখর গ্রাম-বাংলার ঘরে ঘরে যে আড্ডার আসর বসে, ফাঁকে ফাঁকে পল্লিবাংলার শ্রমজীবী মানুষের অসমাপ্ত কাজগুলোও যে আড্ডার ছলে সারা হয়ে যায় সেই কিচ্ছাকাহিনি শোনার যে লোকায়ত চিত্র তা তুলে ধরা হয়েছে উক্ত কবিতায়- 'গাঁয়ের চাষীরা মিলিয়াছে আসি মোড়লের দলিজায়/ গল্প গানে কি জাগাইতে চাহে আজিকার দিনটায়!/ কেউ বসে বসে কাথারী চাঁচিছে, কেউ পাকাইছে রশি;/ কেউ বা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাকা বাঁধে কষি কষি।'

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জসীমউদ্দীন এর পরবর্তী সময়ের কবিরাও বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাদের মধ্যে কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু এদের কবিতায় বর্ষার কথা উঠে এসেছে। প্রকৃতির যে কতো রূপ আর ঐশ্বর্য ছড়িয়ে রয়েছে তার কোন হিসেব নেই।

রূপসি বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। প্রকৃতির সেই রূপের ভেতর দিয়েই তাঁর কবিতায় বিভিন্ন ঋতুর চরিত্র অংকন করেছেন। তবে তাঁর কবিতায় ঋতুর বৈশিষ্ট্যগুলো এসেছে চিত্রকল্পের সঙ্গে বিমিশ্র হয়ে খণ্ড-খণ্ডভাবে যেনো আকশে ভাসমান ছিন্ন মেঘের পালের মতো। তেমনিভাবে বর্ষা নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর লেখা একটি বর্ষার কবিতার অংশবিশেষ- 'বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ চেয়ে রবে;/ ভিজে পেঁচা শান্তস্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে/ শোনাবে লক্ষীর পক্ষ- ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে।'

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমসাময়িক আরেক কবি অমিয় চক্রবর্তী। তিনিও বর্ষার বৃষ্টিবিধৌত প্রকৃতির তরঙ্গ-হিল্লোলিত স্বভাবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। বর্ষা নিয়ে অমিয় চক্রবর্তী'র একটি কবিতা- 'অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।/ ধানের খেতের কাঁচামাটি, গ্রামের বুকের কাঁচাবাটে,/ বৃষ্টি ঝরে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারা জলে।'

আধুনিক কবিদের মধ্যে আধুনিক শিল্পভাবনার অন্যতম বিশিষ্ট কবি বুদ্ধদেব বসু। ষড়ঋতু নিয়ে বুদ্ধদেব বসু অনেক কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে বর্ষা নিয়েও তিনি কবিতা লিখেছেন। বর্ষা নিয়ে তিনি বাংলাদেশ এবং কোলকাতার বর্ষার রূপবৈচিত্রতার নির্মম বাস্তবতা নিয়ে বর্ষাকালীন অবস্থার চিত্রপট তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। এছাড়াও তিনি বর্ষায় একটানা যে বৃষ্টিপাত হয় মর্ত্যভূমে যখন ধূসরতা নামে, ভিজে হাওয়ার শীতল পরিবেশতৈরি হয় এবং ব্যাঙের যে অবিরাম ডাক শুরু হয় সেই ডাক ব্যতিক্রমী ধারায় বর্ষার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। এমনই একটি কবিতার কিছু অংশবিশেষ এরূপ- 'বর্ষায় ব্যাঙের ফুর্তি। বৃষ্টিশেষ, আকাশ নির্বাক;/ উচ্চকিত ঐক্যতানে শোনা গেলো ব্যাঙেদের ডাক।/ একটি অক্লান্ত সুর; নিগূঢ় মন্ত্রের শেষ শ্লোক/ নিঃসঙ্গ ব্যাঙের কণ্ঠে উচ্চসারিত- ক্রোক, ক্রোক, ক্রোক।'

পরবর্তীতে বিভিন্ন দশকের বিভিন্ন কবিগণ বর্ষা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি শামসুর রাহমানের বৃষ্টি বন্দনায় অনাবৃষ্টি কবিতায় লিখেছেন- 'টেবিলে রয়েছি ঝুঁকে, আমিও চাষীর মতো বড়/ ব্যগ্র হয়ে চেয়ে আছি খাতার পাতায়,/ যদি জড়ো হয় মেঘ, যদি ঝরে ফুলবৃষ্টি/ অলস পেন্সিল হাতে বকমার্কা। পাতাজুড়ে আকাশের নীল।'

পরিশেষে বলতে হয়, এভাবেই পূর্ববর্তী কবিদের ধারাবাহিকতায় এখনো চলছে বর্ষার বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে কবিদের কবিতা লেখা। এখনো প্রতি বর্ষাঋতু এলেই বিভিন্ন ছোটকাগজ বা দৈনিক পত্রিকার সাময়িকীগুলোতে আয়োজন করা হয় বর্ষা নিয়ে কবিদের কবিতার প্রকাশ। এভাবেই হয়তো যুগে যুগে প্রকৃতির এই ঋতুরানি-বর্ষাকে নিয়ে কবিদের ভাবের সীমা অসীম হয়ে উঠবে। কবিতার রাজ্যে বর্ষার কবিতাও তার সৌন্দর্যে ফুটে উঠবে। প্রকৃতির মতো করে বর্ষাও বারেবারে নতুন যৌবন পাবে। কবিদের হাত ধরে কবিতার এই নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরে উঠুক আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ- এই হোক বর্ষা ঋতুর প্রতি আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও গবেষক

নিঝুমকন্যা

প্রত্যয় জসীম

দ্বীপকন্যা বুকের পাঁজর তোমার কী মনোরম
উথাল পাথাল... তবু আছে লাজ রক্তিম শরম...।
নতুন চরের মতো তোমার রুপালি মুখখানি
গভীর মমতায় কাছে টানো দ্বীপরানি...।

তোমার চোখে মায়াহরিণেরা করে খেলা
এ চোখে ভালোবাসা রেখো... প্রেমময় সারাবেলা

নিঝুম দ্বীপ নামার বাজার-তমরুদ্দি-নলচিরাঘাট
প্রেম-কাম-ঘামে-চুম্বনে ভরাঘাট... স্মৃতির কপাট।

নিঝুমকন্যা নিঝুম মনিদ্বীপ সুন্দরী কতো উপমা
সব উপমা ম্লান তোমার উপমাবলি নিরুপমা...।

নিঝুমকন্যার বুকে নতমুখে ফিরে আসি বারবার
ভালোবাসা ছাড়া কবির নেই কোন কারবার...।

বোদলেয়ার পড়ছি যেই

অনিরুদ্ধ আলম

ময়ূরী ছাড়া অন্য কিছু হৃদয় বোলে কখনো জানি নাই
ব্যালকনিতে পোকাতে-খাওয়া, অর্ধছেঁড়া বিকেল পড়ে আছে
বোদলেয়ার পড়ছি যেই, সাগরে পুড়ে আকাশ জলপাই
সিংহলের বৃহস্পতিতে বৃষ্টি নামে অনুতাপের আঁচে।

ব্যর্থতার মৃত্তিকাতে বেলা কি ফণীমনসা হয়ে বাড়ে?
এলিয়েনের মিউজিয়ামে হতাশাবোধ জলের ফ্রেমে রাখা
তুলবশত দোলনা ছেড়ে এ-দেশে আসো। হেমন্তের পাড়ে
অমলতাস ছড়াল আলো। ও-আয়নায় তোমার মুখ আঁকা।

মেঘেরা কত বেড়াল হল। বেড়ালও তবে মেঘের স্তূপ
পূর্বে কোনো জন্মে বুঝি ছিলাম আমি বটের লাল ফল
তৃষ্ণা খাঁটি সোনার বাটি মাজতে জানে। গিটার অপরূপ
এ-মনে কেন বাজিয়ে যাও? কুড়াই নানা ক্লোরোফিলের ঢল।

আমাকে তুমি বাধ্য করো বৃক্ষ হতে। হলে না আর পাখি
তোমাতে থেকে তেমন করে তোমার থেকে পৃথক হতে থাকি।

বর্ষার কদম

মোখলেছা খাতুন

আষাঢ়ে বর্ষার জলে নেয়ে
কদমের ভেজা পাপড়ির মত
একগুচ্ছ কদম হাতে পেয়ে
কিশোরী দাঁড়িয়ে রাস্তার পাশে
মুখে অনাবিল হাসি হেসে
বলে, ফুল নিবেন আপা- ফুল
চোখের পাপড়িতে জল পড়ে চুঁইয়ে
জীবনের চাকা সচল রাখতে
কি বর্ষা কি রোদ, ঝড়-তুফান
ছোট্ট শরীরে যায় বয়ে।
ক্ষুধার অজগর থামাতে
নাই দিন, নাই রাত
ওদের শ্রম চলে অবিরাম
জীবনের প্রথম পাতা থেকে
শুরু হয় বাঁচার সংগ্রাম।
বুঝি না, কেন এই অসম জনম
লোকে বলে, কর্মফলে ঘটে অঘটন
ভাগ্যের দোষ দিয়ে কাটায় জীবন
জনম, না জীবন কোনটার মতন
একই মায়ের জঠরে নাড়িছেড়া ধন।
একই পাল্লার কাটায় ওজন বেশি কম
পৃথিবীর সবকিছু চলে নিয়ম মতন
শুধু বাকহারা নদীর মত ওদের জীবন
কেন মানুষে মানুষে অসম জীবনাচরণ?
করুনাময়ের কাছে একটি আবেদন।
ধনী-গরিব ভেদাভেদ ভুলিয়ে দাও
সবে মিলে করে তুলি সুন্দর জীবন
পৃথিবীতে এনেছ যখন দিয়ে হৃদয়ের স্পন্দন
তোমার রহস্য নিয়ে, থাক নিরজন
সাধ্য কি, জানার তোমার ইচ্ছের কারণ।
শুধু চাই, তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ
সবার মুখের হাসিটুকু থাক অম্লান
হে প্রভু, দয়াময় তোমার কাছে
এই মিনতি করলাম।

শান্তি-শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও বিশ্বনিরাপত্তার মহাসম্মেলন

মাওলানা মুফতি মোঃ ওমর ফারুক

> বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর অসীম ভালোবাসা ও বিশেষ করুণা লাভের অফুরন্ত সুযোগ গ্রহণের মাধ্যম হিসাবে দান করলেন দুনিয়ার প্রথম ঘরকে কেন্দ্র করে হজের বিধান। দাওয়াত করলেন বিশ্ববাসীকে মহাসম্মেলনের। বিশ্বজাহান হতে আগত নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ, নানান দেশের নানান ভাষার মানুষ, কেহ সুন্দর-অপরূপ সুন্দরী, কেহ কালো, কেহ লম্বা, কেহ খাটো সকলের মুখে একই জয়ধ্বনি- একই শ্লোগান, একই সুরে "লাব্বায়িক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লা শারি কালাকা লাব্বায়িক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকালাক্"।

ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান নামাজ। যার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা বলে শেষ করা যায় না। তদুপরি একই সময়ে পৃথিবীর সব জায়গায় তা আদায় করা হয় না। ভৌগলিক কারণে সময়ের ব্যবধানে কোথাও কিছু সময় আগে অথবা কিছু সময় পরে ওয়াক্ত হয় এবং সেই হিসাবে আদায় করা হয়। অদ্রূপ রোজা বা সিয়াম পালনের গুরুত্বও অপরিসীম তথাপি সিয়াম সাধনে বিশ্বব্যাপী সেহরি এবং ইফতারের সময়ে পার্থক্য হয়ে থাকে। কোথাও দু'চার ঘন্টা আগে বা পরে হয়ে থাকে। কিন্তু হজ এমন এক মহাবিধান বা ইবাদত, যার মৌলিক কর্মসূচিগুলো গোটা পৃথিবী হতে আগত নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই সময়ে একইভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা ও অন্যের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে মিলেমিশে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আদায়

করতে হয়। কারণ কেহ যদি ইহরাম বাঁধার পর কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত হয় তাহলে তার হজ্জ বাতিল।

এর দ্বারা অতি সহজেই বুঝা যায় যে, হজ্জ শুধুমাত্র একটি ইবাদত নয় বরং শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিশ্বনিরাপত্তার এক মহাসমাবেশ বা সম্মেলন। হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম, মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন "মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল তাহা তো বাক্কায় (মক্কায়) উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী আলোকবর্তিকা, শান্তি-শৃঙ্খলা সমৃদ্ধি ও বিশ্বনিরাপত্তার সকল কল্যাণের হেডকোয়ার্টার। সুরা আল ইমরান: আয়াত ৯৬।

বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর অসীম ভালোবাসা ও বিশেষ করুণা লাভের অফুরন্ত সুযোগ গ্রহণের মাধ্যম হিসাবে দান করলেন দুনিয়ার প্রথম ঘরকে কেন্দ্র করে হজ্জের বিধান। দাওয়াত করলেন বিশ্ববাসীকে মহাসম্মেলনের। বিশ্বজাহান হতে আগত নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ, নানান দেশের নানান ভাষার মানুষ, কেহ সুন্দর-অপরূপ সুন্দরী, কেহ কালো, কেহ লম্বা, কেহ খাটো সকলের মুখে একই জয়ধ্বনি- একই শ্লোগান, একই সুরে "লাব্বায়িক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লা শারি কালাকা লাব্বায়িক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকালাক্"! আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির, আমি হাজির, কোন শরিক নাই তোমার, আমি হাজির নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ কেবলমাত্র তোমারই, সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোন শরিক নাই তোমার। সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় খালি পায়ে খালি মাথায় সকলের সম্মিলিত সুরে একই ধ্যান-ধারণায় একই সারিতে একই কাজের দৃশ্য কি যে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ! কি যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধন। যেখানে ভিনদেশি, ভিন্ন ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ জনতা, তবু নেই কোন হাতাহাতি- নেই কোন বাড়াবাড়ি, হয় না কোন ধরাধরি, নেই কোন মারামারি, শুধু শান্তির পয়গাম সকলের দাবি, কতই না চমৎকার দৃশ্য! পৃথিবীর আর কোথাও এমন দৃশ্য আছে কি? না না বিশ্বমানবতার এমন মহাসম্মেলনের, মহাব্যবস্থাপনার শক্তি-সামর্থ, স্থান আর কারো নেই- আর কোথাও নাই। শুধুমাত্র লা শরিক আল্লাহর।

এমন অদ্বিতীয়, অসাধারণ, অতুলনীয়, মানবতা মনুষ্যত্বের, শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তার একমাত্র মডেল, সম্মেলনের পরে আর কোন সম্মেলন পাবেন না। যে জায়গার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জায়গা পৃথিবীতে আর নেই, সেই মহাসমাবেশে আপনি যাবেন না! শক্তি সামর্থ থাকার পরও নানা অজুহাতে দেরি করবেন? জীবনে একবারও যাওয়া হবে না! যাই-যাচ্ছি করে জীবনবাতি নিভে যাবে! তাহলে আপনি যাবেন কোথায়? জেনে রাখুন! আপনি হতভাগ্য, কপালপোড়া, মহানবির সুপারিশ আপনার নসিবে নাও হতে পারে। কারণ রাহমাতুল্লিল আলামিন রাসুল (সাঃ) ধমক দিয়ে বলেছেন "যার সামর্থ থাকার পরও হজ্জ করে নাই, সে হয় ইহুদি কিংবা নাসারা হয়ে মরুক, ইহাতে কিছু যায় আসে না" কি কঠিন ভবিষ্যৎবাণী! যার প্রতিটি বাণীই আল্লাহপ্রদত্ত। সাবধান! সতর্ক হয়ে যান! এ বছরই চলুন, এবার সম্ভব না হলে আগামীতে কোন বাধাই যেন আপনাকে পেয়ে না বসে একুণি প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, খালেস এরাদা করুন, ঘরের মালিকের কাছে বলুন, তাঁর সাথে যোগাযোগ বাড়িয়ে দেন, তাঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে তাহাজ্জুতের সালাত, নিবিড় সর্ম্পকের অতি উত্তম সময়- এ সময়েই তাঁকে পাবেন, আশা রাখুন, কাজ শুরু করে দেন। যদি কোন ক্ষেত্রে আপনার শক্তি সামর্থের কোন কমতি থাকে তিনিই তা পুষিয়ে দেবেন। যিনি খুঁটি ছাড়া আসমান দিলেন, একফোঁটা নাপাক পানি হতে আমাদেরকে সৃষ্টি করে এত শান শওকত দিলেন, কাউকে ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে কাউকে সরিয়ে দেন, তাঁকেই বলুন, ব্যবস্থা হবেই। তিনিই মহাব্যবস্থাপক আর কেউ নয়।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, যদি কেহ বড় কোন কোম্পানির ম্যানেজার হয় অথবা অন্য কোন দামি পোস্টে আসীন থাকেন আর কোম্পানি তাকে ২/৪ জনকে নিয়ে হজ্জে যাওয়ার সুযোগ দেয়- সেইক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঐ ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন, গোষ্ঠী-গ্যাতি নিয়ে বার বার হজ্জ ওমরাহ পালন করে নিজেকে অনেক বড় মুসলমান হিসাবে জাহির করে কিন্তু বাস্তবে তার অধিনস্ত সাধারণ কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের সুযোগ সুবিধাও দিতে চান না, অনেক ক্ষেত্রে যেন জুম্মার নামাজও আদায় না করতে পারে সেজন্য শুক্রবারে অফিসে আসতে বাধ্য করেন, রমজান মাসে রাতে ক্যান্টিরিতে কাজ করতে বাধ্য করান এমনটা যেন না হয়, তাহলে তার হজ্জ ব্যর্থ। শুধু তাই নয় দু'এক জন অসুস্থ কর্মচারী চিকিৎসার অভাবে বিছানায় কাতরাবে, অথবা চিকিৎসার জন্য ছুটি পাবে না সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজারের কোন ভূমিকা থাকবে না তা হয় না। কিন্তু তার নিজের গায়ে সামান্য জ্বর এলে বিদেশের হাসপাতালে চলে যাবে! ইহা কাম্য নয়। সাবধান! এ ব্যাপারে আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে। শুধু হজ্জ-ওমরাহ, জুম্মার নামাজই ইসলাম নয়, অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। ইসলামে হজ-ওমরাহ'র যেমন গুরুত্ব আছে, তদ্রূপ মানবতা মনুষত্ব, অধীনস্থ অসুস্থ প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়েরও গুরুত্ব রয়েছে। তাদের অধিকারও সংরক্ষণ করতে হবে। সকলকেই সকলের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিশ্বনিরাপত্তার মহাসম্মেলন যার চারপাশে অগণিত শান্তিকামী ফেরেস্তারা মহান মাবুদের মেহমানদেরকে সকাল-সন্ধ্যা পাহারা দিচ্ছে তাদেরকে "আহলান সাহলান মারহাবা" বলে স্বাগত জানাচ্ছে! জান্নাতি পরিবেশে আলিঙ্গন করছে। যে ঘরে মাত্র এক রাকাত নামাজ আদায় করলে পৃথিবীর যে কোন মসজিদে এক লক্ষ রাকাত নামাজ আদায়ের সমান ছওয়াব হয়, যে পাথরে চুমু খেলে অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যায়, যার চারপাশে এমন কিছু অতিগুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে যে স্থানগুলোতে দু'য়া কবুলের নিশ্চয়তা। যেখানে দুনিয়ায় আগমনকারী সকল নবি-রাসুলের পদধূলির সংমিশ্রণ হয়েছে, যেখানে আদিপিতা হযরত আদম (আঃ) ও মা হাওয়া (আঃ) দীর্ঘ প্রায় ৩৫০ বছর পর সাক্ষাৎ হয়েছে। শুধু তাই নয়- সোয়া লক্ষ সাহাবির উপস্থিতিতে আরাফার মাঠে বিদায় হজ্জের জগদ্বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করা হয়েছে। যার চতুর্পাশ শুধু রহমত, বরকত আর কল্যাণে ভরপুর! আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভৌগলিকভাবে যে দেশের ভূখণ্ড শুধু ধুধু মরুভূমি, এবং পাহাড় আর পাহাড়, কিছু খেজুর গাছ ব্যতীত তেমন কোন গাছপালা নেই বললেই চলে। সেখানে পৃথিবীর সকল ফল-ফলাদিতে পরিপূর্ণ!

কার ইশারায় এমন অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে? যেখানে কোন পুকুরের কল্পনাও করা যায় না, এবং নলকূপ বা ডিপমেশিনে স্বাভাবিক পানি পাওয়া দুরূহ ব্যাপার, সেখানে নির্মল স্বচ্ছ ডালিমের রসের চেয়েও সুমিষ্ট, অতুলনীয় স্বাদ ও পুষ্টিতে ভরপুর জান্নাতের ঝরনাধারার সেই সুপ্রসিদ্ধ যমযমের পানিতে সয়লাব! যা একবার পান করলে হৃদয়, মন-প্রাণ ভরে যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার নাম ও স্বাদের আকর্ষণে আবারও মন চায় আরো কয়েক গ্লাস পান করি। বাকি জীবনের সবটুকু পিপাসা মিটিয়ে যাই! আহ! ইহা যে কি অতুলনীয় রহমত বরকত সুস্থতা ও কল্যাণকর জ্ঞানলাভের মহৌষধ! যা নামে যমযমের পানি! কিন্তু বাস্তবে সর্বরোগের মহৌষধ! যুগ যুগ ধরে যমযমের পানিকে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ যেকোন রোগের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াবিহীন, লিকুইড মেডিসিন হিসাবে গ্রহণ করেছে! আপনি তা পান করতে যাবেন না! তাহলে যাবেন কোথায়?

সে কোন মহামানব! যার দু'য়ার বরকতে ধূধূ মরুভূমি, ফলের নগরীতে রূপ নিল, শান্তি-নিরাপত্তা শৃঙ্খলার মডেল নগরী হিসাবে পরিগণিত হল! আপনি কি জানেন তিনি কে? তাঁর নীতি আদর্শ কী ছিল? কী ছিল তার দৈনিক কর্মপন্থা? যিনি মুসলিম জাতির নামকরণ করলেন, যিনি মুসলিম জাতির পিতা! যার স্মৃতিবিজড়িত মক্কা, মাকামে ইব্রাহীম, যে দু'জন পিতা-পুত্র ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ) নিজহাতে কা'বা নির্মাণ করলেন, যুগ যুগ ধরে যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ প্রতি বছর, কুরবানি করছে! ঐ মহাস্থানের মহাসম্মেলনে যোগ দিতে মুসলিম উম্মাহ জান-প্রাণ উজাড় করে দিবে কমপক্ষে জীবনে একটিবারের জন্য হলেও ছুটে যাবে! এটাই তো স্বাভাবিক।

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হানাহানি-মারামারি কাটাকাটি চলছে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ,আত্মঘাতী হামলায় প্রতিনিয়তই সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাতকে পাখির মত গুলি খেয়ে মরতে হচ্ছে গোটা বিশ্ব অশান্তির দাবানলে জ্বলছে! বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রই ভয়-আতংকে এবং কি জানি, কি এক, অজানা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে! এসব কিছু হতে পরিত্রাণ পেতে হলে, রাস্তা-ঘাট অফিস-আদালত, রাজপ্রাসাদ সর্বত্র নিরাপত্তা লাভ করতে চাইলে, এই ঘরের মালিকের উপাসনা, ইবাদত বন্দেগি করতে হবে- এর কোন বিকল্প নাই। এরশাদ হচ্ছে "তারা যেন এই ঘরের মালিকেরই ইবাদত করে যিনি খোদায় অন্ন যোগান এবং ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা দান করেন"। সুরা কুরাইশ; আয়াত (৩-৪)। এই ঘরকে সামনে রেখে এই ঘরের মালিকের দেয়া বিধান অনুযায়ী যে ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের কর্মসূচি প্রণয়ণ করবে, তারা সর্বত্র শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, দূর হবে সকল প্রকার ভয়-ভীতি।

দুনিয়ায় আগত সকল নবি-রাসুল যে সকল বিষয়াবলীর সাথে সরাসরি জড়িত তাঁরা যে স্থানে যে তারিখে যে কাজটি করেছেন আপনি সেই স্থানে সেই কাজটি করবেন। ইহা আসলেই কত মহাসৌভাগ্যের বিষয় তা কি একবারও গভীরভাবে চিন্তা করেছেন? যদি বিষয়টিকে ঐভাবে বিবেচনায় না নিয়ে থাকেন, তাহলে আজ থেকে এখন থেকে একটু ভেবে দেখুন! আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করুন, দু'চোখ বন্ধ করে সামান্য সময় ফিকির করুন, দেখবেন জবাব পেয়ে যাবেন। দুনিয়ায় এরচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান, মান-সম্মান, চাওয়া-পাওয়ার আর কোন কিছু আছে কি? না না পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম স্থান আর নেই, এরচেয়ে শ্রেষ্ঠ জায়গা আর নেই। থাকবেই কি করে- যিনি বিশ্বজাহানের মালিক তাঁর ঘরকে কেন্দ্র করে তিনিই এসব আয়োজন করেছেন।

বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক সাইয়্যেদুল মুরসালিন যিনি মহান মা'বুদের সকল বিধি-বিধান শতভাগ পালন করে তাঁর নৈকট্য লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। যার জীবনের সকল কিছু এ শহরে। যিনি মদিনা মুনাওয়ারায় শুয়ে থেকে তাঁর রওজায় আমাদেরকে সালাম দেওয়ার সুযোগ করে দিলেন। যার নিজহাতে তৈরি মসজিদে নববি, যেখানে এক রাকাত নামাজ আদায় করলে দুনিয়ার অন্য যে কোন মসজিদে পঞ্চাশ রাকাত নামাজ আদায়ের ছওয়াব পাওয়া যায়। আপনি সেখানে যেতে গড়িমসি করবেন? সেই মহাস্থানের মহাসম্মেলনে! যাকে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সুরা আত্ তীনের ৩নং আয়াতে বালাদিল আমিন (নিরাপদ শহর) বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যে এলাকায় বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষকের জন্ম, কর্ম, যেখানে তাঁর বেড়ে ওঠা, যে পাহাড়ের গুহায় বিশ্বমহীয়সী নারীকুলের শিরোমণি হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) এর পথচলা, যে জমিনের বুকে এতিম নবি মুহাম্মাদুর রাসুল (সাঃ)-কে হালিমাতুস সাদিয়া (রাঃ) দুধ পান করিয়েছেন, যেখানে রয়েছে জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তি মহাপুরুষ হযরত আবু বকর (রাঃ)- যার পাশে ঘুমিয়ে আছেন বিশ্বসেরা ন্যায়বিচারের জলন্ত প্রতীক হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। যার চলার পথে মরদুদ শয়তান পথ চলতে সাহস করত না। যে মহামানবকে উদ্দেশ্য করে রাসুল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন "মোর পরে যদি হত কোন পয়গাম্বর তাহলে হত সে এক ওমর।" যে হেরা গুহায় দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সাইয়্যেদুল মুরসালিন ধ্যানমগ্ন থেকে সকল আসমানী কিতাবের শ্রেষ্ঠ কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রথম ওহি পেয়ে মানবতা মনুষ্যত্বকে জাহিলিয়াতের ঘোর অন্ধকার হতে উদ্ধার করে জান্নাতের মেহমান বানিয়েছেন। যে এলাকায় আশারায়ে মোবাশ্শারা, অগণিত সাহাবায়ে আজমাইন ঘুমিয়ে আছেন যার অদূরে রওজাতুল মিন রিয়াজিল জান্নাহ অবস্থিত। সেই পাক-পবিত্র, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম স্থানের মহাসম্মেলনে সুযোগ থাকার পরও যোগ না দেয়া, না যাওয়া নানা রকম পড়িমসি করা- এবছর নয় পরের বছর, মেয়ের বিয়ে শেষ করে, ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর পরে, আগামী বছর ভাল ব্যবসা করতে পারলে, চাকুরি হতে অবসর নিলে, বাড়ি বানানোর কাজ শেষ হলে ইত্যাদি অজুহাতে কিছু বয়:বৃদ্ধ অতি বয়স্ক নারী পুরুষ বাংলাদেশ থেকে হজে যান- যাদের অধিকাংশই হজের আরকান আহকামগুলো যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না। বরং অনেকের ক্ষেত্রে বায়তুল্লাহতে নিয়মিত নামাজ আদায় করাই সম্ভব হয় না। শারীরিক দুর্বলতার কারণে বাধ্য হয়ে সংশ্লিষ্ট বাসা-বাড়িতে অথবা ঘরে বসে নামাজ আদায় করেন। এমনটা হওয়া উচিত নয়। হজের অনেক কাজ শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে, তাই যুবক বয়সেই যাওয়া উচিত। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের মুসলমান তাই করেন।

লেখক: গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যাংকার

সমুর দিনরাত্রির কথকতা

জাকিয়া সুলতানা

পাঁচটা টিউশনি সেরে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরে সমু। সমু খান। তবলা বাজায়। তবলাবাদক। অন্যদিনের চেয়ে আজ একটু দেরিই হলো। শেষ টিউশনিটা সেরে বাদল ভাইয়ের সাথে গিয়েছিল জহির সাহেবের বাসায়। বাদল ভাইয়ের খুব ঘনিষ্ঠজন জহির সাহেব। জহির সাহেবের ছেলে সুমন ক্লাশ ফাইভে পড়ে। গান শেখে। তবলার সাথে সংগত করার জন্য সমুকে নিয়ে গিয়েছিল বাদল। সমু অনেক বড়লোক দেখেছে। বড়লোকের বাড়ি দেখেছে। কিন্তু জহির সাহেবের বাড়িটা যেন তাজমহল। সমু সামনাসামনি তাজমহল দেখেনি। ছবিতে দেখেছে তাজমহলের কারুকাজ। ক' কোটি টাকা খরচ করেছেন জহির সাহেব কে জানে। সমু ভাবে মানুষের এত টাকা কি করে হয়! কোন্ ব্যবসা করলে বা কী চাকুরি করলে এত-এত টাকার সন্ধান পাওয়া যায়! না, সমু তার তবলা বাজানো ছেড়ে দিতে চায় না। তবলার ছন্দে যেন তার জীবন বাঁধা। তবলার ছন্দে-ছন্দে তার জীবনও ছন্দায়িত হয়। তারপরও বুকের ভেতর ক্ষীণ একটি প্রত্যাশা, একটি সাধ জেগে থাকে টাকা পয়সার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। ও পাঁচটা টিউশনি করেও যেন সংসারে স্বাচ্ছন্দ আনতে পারে না। একমাত্র ছেলে টুকু। এবার ক্লাশ থ্রিতে উঠেছে। স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। ভর্তি ফি, বেতন, স্কুল ড্রেস এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ পুরো তিন হাজার টাকা পকেট থেকে চলে গেল। না করে উপায় নেই। ও নিজে না হয় সাধারণ স্কুলে পড়েছে। কিন্তু যে দিনকাল পড়েছে ছেলেকে মাঝারিমানের স্কুলে ভর্তি না করালেই নয়। শিল্পীসমাজে সমুর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা। অনেকে হয়তো বলেই ফেলবে কি ব্যাপার এত টাকা পয়সা কামাই কর, একমাত্র ছেলেকে ভর্তি করালে কিনা এই সাধারণ স্কুলে? সমুতো জানে ওর কি আয়। বাড়িভাড়া, ছেলের পড়াশোনা, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা আর সংসার খরচেই তো সব শেষ হয়ে যায়। জমানো কিছুই থাকে না। স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক সময় খরচ করতে হয়।

ঘরে ফিরে সেই স্ট্যান্ডার্ড এর নমুনা দেখতে পেল ডাইনিং টেবিলে। একসেট কাপ পিরিচ।

- কি ব্যাপার, এগুলো কোথ্থেকে?

- কোথ্থেকে আবার? মার্কেট থেকে।

- মার্কেট থেকে? কে এনেছে?

- আমি এনেছি।

- তুমি?

- হ্যা, আমার কাছে সংসার খরচের যে টাকা দিয়েছিলে সেখান থেকে একহাজার টাকা দিয়ে উপরের ফ্ল্যাটের ভাবীর সাথে গিয়ে নিয়ে এসেছি। কাপগুলো সুন্দর, তাই না?

- কাপগুলো সুন্দর। তারচেয়ে সুন্দর একহাজার টাকা। তা তুমি যে টাকা খরচ করে ফেললে সংসার চলবে কীভাবে?

- তুমি এমনভাবে কথা বল যে, বিশ্বাস হয় না- তুমি একজন শিল্পী। শিল্পীর মুখে এধরনের কথা শোভা পায় না।

- শিল্পীকে ভাত খেতে হয় না তো। হাওয়া খেয়ে বাঁচে। তাই যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা টাকা ওড়ালেই হয়।

- কি, কি বল্লে আমি টাকা ওড়াই? ঠিক আছে আজই ফেরত দিয়ে আসবো।

- তোমার এই এক দোষ। পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা কর না। আমার হাতে কত টাকা আছে, তোমাকে সেটা জানতে হবে কিছু কেনার আগে। আমি তো কখনো, কোন

ব্যাপারে তোমাকে বাধা দেইনি। বরং আমি নিজেই তোমাকে এটা সেটা কিনতে বলেছি এবং কিনেও দিয়েছি। কিন্তু গত তিন মাস থেকে যে টানাটানি যাচ্ছে তাতো বুঝতে পারছো। কম করে হলেও প্রতিমাসে দু'হাজার টাকা চলে যাচ্ছে ছেলের স্কুল আর মার চিকিৎসা বাবদ। এগুলোকে তো আর এড়িয়ে যেতে পারি না।

- ঘাট মানছি। আমার অন্যায় হয়েছে। ভুল হয়েছে। যদি বলোতো ফেরত দিয়ে আসি।

- না, যা কেনা হয়েছে তা আর ফেরত দেয়ার দরকার নেই।

সমু ঘরে চোখ বুলিয়ে টুকুর খোঁজ করে।

- টুকু কোথায়? দেখছি না যে।

- টুকু কি এখনো জেগে থাকবে?

- কেন ক'টা বাজে? মাত্র তো ১০টা। এরমধ্যেই ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছ?

- কি আর্শ্চয, ছেলের ঘুম পেলে ঘুম পাড়াব না? একরত্তি ছেলে। তাকে রেখে, অসুস্থ মাকে রেখে রাত করে বাড়ি ফেরো। আবার কৈফিয়ত চাচ্ছ ছেলে ঘুমালো কেন, তাই না?

- কেন রাত হলো তুমি কি জানতে চেয়েছ?

- জানতে চাওয়ার সুযোগ পেলাম কোথায়। এসেই তো রাপারাপি শুরু করলে।

পাশের ঘর থেকে মার গলা শোনা গেল।

- সমু বাবা, কি হলো এত রাগারাগি করছিস কেন? কি হয়েছে?

সমু মার ঘরের দিকে এগুলো। মার কাছে এসে মাথায় হাত বুলায়।

- কি হয়েছে বাবা?

- না মা তেমন কিছু হয়নি। বাসায় ফিরতেই কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার উপর টুকুর সাথে দেখা না হলেও ভালো লাগে না।

- ছোট্ট বাচ্চা। কতক্ষণ জেগে থাকবে বল? তুই না হয় একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার চেষ্টা করিস বাবা। আজ অন্যদিনের চেয়ে দেরি হলো মনে হয়।

- হ্যাঁ মা, আজ নতুন একটা টিউশনি পেলাম। মা, ওরা এত বড়লোক যে কি বলবো তোমাকে। আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করে, সংসার থেকে দূরে থেকে কতই বা আয় করছি। অথচ আজ যাদের বাসায় গেলাম ভদ্রলোক ব্যবসা করেন শুনেছি। কিন্তু কী ব্যবসা করেন জানি না। উনার এত টাকা কীভাবে, কোন উপায়ে যে উপার্জন করেছেন ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যায়।

- মাথা গরম করার দরকার নেই বাবা। যার যত টাকা তার তত হিসাব হবে আখেরাতে। অল্প টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক বাবা। যা আছে এই যথেষ্ট।

- তোমার কাছে তো যথেষ্টই মনে হয়। কই তোমাকে ফলটল খাওয়াতে পারছি বল?

- বাবা, আমার ঐসবের দরকার নেই। আমার দাদাভাইকে এনে দে, তাতেই আমার খাওয়া হবে।

- মা, তাও কি ইচ্ছে করে না? কিন্তু পারছি কই?

- আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। আল্লাহ নিশ্চয়ই মনের আশা পূরণ করবেন।

সমু উঠে দাঁড়ায়। মাকে ভাত খাওয়ার কথা বললে মা বললেন,

- দাদুভাইকে নিয়ে খেয়েছি। তোরা খেয়ে নে।

সমু হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসলো। এখন ওর মাথা অনেক ঠান্ডা। হঠাৎ-হঠাৎ কি যে হয় বেণু বুঝতে পারে না। ভাবে শিল্পীরা বুঝি এমনই। ঝট করে রেগে যায়। আবার মুহূর্তেই ঠান্ডা পানি। সমুর মনটা ভালো। যখন ওর মেজাজ ভালো থাকে মন খুলে রাজ্যের কথা বলে। আর সেই কথা বলতে বলতেই জানালো নতুন টিউশনির কথা।

- বিরাট বড়লোক। এত বড়লোক যে, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

- তাই নাকি? স্ত্রী বলে।

- হ্যাঁ তাই।

- বেতন কত দিবে?

- বলেছে বেতন নিয়ে কোন অসুবিধা হবে না।

- তবু একটু জানা দরকার ছিল।

- কী দরকার, অসুবিধা হবে না যখন বলেছেন তখন নাইবা জিজ্ঞেস করলাম।

- তোমার যেমন ইচ্ছা।

সমু ডাইনিং টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বেণু ঝটপট টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেলে। বেডরুমে গিয়ে মশারি লাগাতে লাগাতে বলল,

- কাল সকালে কি টিউশনি আছে?

- হ্যাঁ। আমাকে সকাল সাতটায় তুলে দিও।

> ধা-ধিন-ধিন-ধা করে সমুর তবলার বোল বেজে উঠে সকাল-সকালই। সকালে ঘন্টাখানেক রেওয়াজ করে সমু। যত রেওয়াজ করা যায় ততই নাকি ভালো। সমু রেওয়াজ করতে বসলে টুকু বাবার পাশে এসে বসে। হাত দিয়ে মেঝেতে টোকা মারে। আর তা দেখে সমু খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। স্ত্রীকে ডেকে বলে,
>
> - এই দেখেছ ছেলের কাণ্ড? আমার সাথে তবলা বাজাচ্ছে।
>
> - এতে খুশি হবার কিছু নেই।
>
> - মানে?
>
> - মানে খুব সোজা। এই যে তুমি ঘুম থেকে উঠে ধা-ধিন-ধিন-ধা করছো কত আয় হচ্ছে বলতো! এর চেয়ে অন্য কোন চাকুরি করলে খুব কি অসুবিধা হতো?
>
> - মাঝে মাঝে তুমি কী যে বল মাথামুণ্ড কিছুই বুঝি না। শিল্পের সাথে অন্য চাকুরির তুলনা করছো, তাই না? শোন শিল্প আর শিল্পীর দাম সবসময়।

- ঠিক আছে।

ধা-ধিন-ধিন-ধা করে সমুর তবলার বোল বেজে উঠে সকাল-সকালই। সকালে ঘণ্টাখানেক রেওয়াজ করে সমু। যত রেওয়াজ করা যায় ততই নাকি ভালো। সমু রেওয়াজ করতে বসলে টুকু বাবার পাশে এসে বসে। হাত দিয়ে মেঝেতে টোকা মারে। আর তা দেখে সমু খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। স্ত্রীকে ডেকে বলে,

- এই দেখেছ ছেলের কাণ্ড? আমার সাথে তবলা বাজাচ্ছে।

- এতে খুশি হবার কিছু নেই।

- মানে?

- মানে খুব সোজা। এই যে তুমি ঘুম থেকে উঠে ধা-ধিন-ধিন-ধা করছো কত আয় হচ্ছে বলতো! এর চেয়ে অন্য কোন চাকুরি করলে খুব কি অসুবিধা হতো?

- মাঝে মাঝে তুমি কী যে বল মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। শিল্পের সাথে অন্য চাকুরির তুলনা করছো, তাই না? শোন শিল্প আর শিল্পীর দাম সবসময়। একজন শিল্পী চাকুরিজীবী হতে পারেন, কিন্তু একজন চাকুরিজীবী কি সহজেই শিল্পী হতে পারবেন? পারবেন না। কাজেই শিল্পী কম উপার্জন করলেও শিল্পীর দাম অনেক বেশি বুঝতে পেরেছ?

- পেরেছি। তবে সেই শিল্প দিয়ে যদি পেট ভরানো যেত তাহলে কোন অসুবিধা ছিল না।

- প্রয়োজনীয় কোন্ জিনিসটার অভাব সংসারে বলতো! বিলাসিতা করলে অনেক করা যায়। কিন্তু বিলাসিতা আমি পছন্দ করি না। আর সকাল সকাল এমন জেরা করাও পছন্দ করি না। যাও, টুকুকে রেডি করে দাও। স্কুলে দিয়ে আসি।

ঠিক আছে- বলে বেণু ছেলের হাত ধরে অন্যঘরে নিয়ে গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই টুকু বাবু হয়ে গেল। স্কুলড্রেস, জুতা, মোজা, কাঁধে ব্যাগ, পানির ফ্লাস্ক। আম্মু খোদা হাফেজ, দাদু খোদা হাফেজ বলে বাবার সাথে বেরিয়ে গেল। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দিয়ে সমু বাসায় ফিরে নাস্তা সেরে বেরিয়ে পড়লো।

দিন দিন করে মাস ছয়েক হয়ে এলো সমুর নতুন ছাত্রকে তবলা শেখানোর। একদিন বাসায় গিয়ে চারদিক তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। বাড়িটা বাতি দিয়ে চমৎকারভাবে সাজানো। বড় একটা গেট, জহির সাহেব সমুরে দেখে এগিয়ে আসেন।

- আসেন মাস্টার সাহেব। কেমন আছেন?

- জ্বী ভালো। বাসায় কোন উৎসব আছে মনে হচ্ছে।

- ঠিক বলেছেন। আগামীদিন আমার মেয়ের পানচিনি। ছেলে আমেরিকা প্রবাসী। ইঞ্জিনিয়ার। ভালো পরিবার।

- ও! সমু মৃদু হাসে।

- শোনেন মাস্টার সাহেব আপনকে দরকার।

- আমাকে?

- হ্যাঁ।

- কেন?

- মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে কোন জিনিসের ঘাটতি রাখিনি। ছেলে-মেয়ে, তাদের মা যে যা বলেছে তাই করেছি এবং করছি। খরচে কোন কার্পণ্য করছি না। বাড়িটা কেমন সুন্দর করে সাজিয়েছি দেখছেন তো!

- হু! তাতো দেখছি। সমু মুগ্ধচোখে বাড়িটার দিকে আবার তাকায়। তাইতো কত সুন্দর করে সাজানো। কিন্তু আর কী বাকি? সমু জহির সাহেবের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে তাকালে জহির সাহেব বলেন,

- মাস্টার সাহেব রিজির বিয়ে উপলক্ষ্যে গান-বাজনার আয়োজন করতে চাই। আপনার জানা-শোনা অনেক শিল্পী আছেন। তাদেরকে দিয়ে একটা জমজমাট গানের আসর করেন। টাকা যা লাগে দেব।

- কবে?

- কালকে।

- কালকে?

- হ্যাঁ কালই তো পানচিনি।

- এখন কাকে-কাকে পাই। সমু ইতঃস্তত করে।

- শুনুন, এটা একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। আমার অনেক সম্মানিত গেস্ট আসবেন এই উপলক্ষ্যে। কাজেই টাকা-পয়সার কোন অসুবিধা হবেনা।

- ঠিক আছে- বলে সমু সেখান থেকে বেরিয়ে তার পরিচিত কণ্ঠশিল্পীদের সাথে যোগাযোগ শুরু করলো।

পরদিন সন্ধ্যায় চারজন কণ্ঠশিল্পী, বেহালাবাদক, বাঁশিবাদক, গিটারবাদক, সবাই সমুর কথামত নির্দিষ্ট বাড়িতে হাজির হলেন। সমু স্ত্রীকে আগেই বলে রেখেছিল। বিকেলে বেরুতে হবে। ছেলেকে সাথে নেবে নাকি? না, থাক। তার চেয়ে এই অনুষ্ঠানে কম করে হলেও হাজার তিনেক টাকা তো পাবো। এই টাকা দিয়ে টুকুর জন্য একটা খেলনা-গাড়ি কিনবে। সমুর মনে পড়লো বেণু অনেকদিন ধরে বলছে একটা ভালো শাড়ির কথা। বেশি প্রয়োজন মায়ের ঔষধ কেনা। দেখা যাক জহির সাহেব কত টাকা দেন। সেভাবেই খরচ করবো- মনে মনে বলল।

পুরো তিনঘণ্টা অনুষ্ঠানের পর রাত করে বাড়ি ফিরলো সমু। দরোজা খুলতেই বেণু দেখলো সমুর মুখটা কেমন মলিন বিষণ্ন আর থমথমে। হাত খালি। বেণুর বুঝতে অসুবিধা হলো না কিছু অসংগতি হয়েছে। হেঁয়ালি করে বলল, খেয়েছো? 'না'। এসো তাহলে। বেণু ভাত বেড়ে দিলো। সমু ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। বেণু কিছুই জিজ্ঞেস করছে না দেখে নিজেই স্বগতোক্তির মত বলল- সবাইকে ম্যানেজার টাকা দিলো। আমাকে দিতে নিলে জহির সাহেব বললেন, মাস্টার সাহেব আমার নিজের লোক। টাকা পরে দেব। নিজের লোক। নিজের লোক আবার কি। একদিনের মধ্যে এত সুন্দর অনুষ্ঠান করতে কত পরিশ্রম হয়েছে, তার মূল্য কি কিছুই না? আবার বলেন খেয়ে যাবেন। কে খায়। বড় লোক আবার।

- বাবা, ওরা বড়লোক। কিন্তু বড় মনের লোক না। তুমি এত পরিশ্রম করে একদিনে বড় একটা অনুষ্ঠান করে দিলে। বড়লোক তো তিনি না। বড় লোক তুমি। তোমার বড় মন। সেই লোক তোমার সামনে ছোট। সমু ফিরে দেখে কখন যে মা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন- টের পায়নি। মার কথাগুলো শুনে সমুর বুকটা গর্বে ভরে গেল। একটু আগেই যে ভাতের দিকে অনীহা নিয়ে তাকিয়ে ছিল এখন তা যেন শুভ্র বেলিফুল। সমু মুগ্ধচোখে ভাতের দিকে তাকিয়ে রইলো।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন শেখ কামাল

ড. সুলতান মাহমুদ

শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের বড় ছেলে। তাঁর জন্ম ১৯৪৯ সালের ৫ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি ছিলেন এক বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী অনন্য সংগঠক। আমরা অনেকেই জানি না ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে ২৬ বছরে থমকে যাওয়া এক চিরতরুণের অনন্য অসাধারণ জীবনকে। খুব ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড ঝোঁক। ঢাকার শাহীন স্কুলে পড়াকালীন স্কুলের খেলাধুলার প্রত্যেকটি আয়োজনে তিনি ছিলেন অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। খেলাধুলার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চার প্রতি আগ্রহ ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা তাঁর প্রতিভা ও মননের এক বিশাল দিককে উন্মোচিত করে। অভিনয়, সংগীতচর্চা, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতাসহ সকল ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমান সমাজে দেশপ্রেমিক-মানবিক -মেধাসম্পন্ন-আত্মমর্যাদাশীল জনগোষ্ঠীর খুবই অভাব। আজকের তরুণদের ভেতর মানবিক গুণের বড়ই অভাব। কিন্তু শেখ কামাল এমনই এক তরুণ ছিলেন যিনি মানবিক গুণসম্পন্ন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আজকের তরুণদের তাঁর সেই মানবিক দিকগুলো জানা দরকার।

বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধারাবাহিক আপসহীন সংগ্রামের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করার ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্মের বছরেই শেখ কামালেরও জন্ম। আওয়ামী লীগের পথচলার যে ধারাবাহিকতা, বঙ্গবন্ধুর জীবন পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, তার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই শেখ কামালের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

ছাত্রলীগের কর্মী ও সংগঠক হিসেবে ৬ দফা, ১১ দফা আন্দোলন এবং '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে বীরোচিত অংশগ্রহণ ছিল তাঁর। অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী শেখ কামাল সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ২৫ মার্চের কালরাতে গণহত্যা শুরু করার পাশাপাশি তীব্র প্রতিহিংসোপরায়ণ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর থেকে গ্রেপ্তার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সবাইকে বন্দি করে রাখা হয় ধানমন্ডির ১৮ নম্বরের বাড়িতে। কঠোর নজরদারি এড়িয়ে কৌশলে পালিয়ে যাওয়া শেখ কামালকে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার চাপাতা বাজার থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে শেখ কামাল 'বাংলাদেশ ফার্স্ট গুয়ার কোর্স'-এর কমিশন পান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পদক, ভারতের পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সহজ শেখ কামালের অনন্য পরিচয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে শেখ কামালের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে নিজের পোশাক থেকে ফতুয়া আর লুঙ্গি এনে বলেছিলেন, জহির ভাই! পরে নিন। নিজের খাবার থেকে আরেক থালায় ভাত-ডাল-সবজি দিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। ঘুমানোর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজের বিছানা। এতে বিব্রত হয়েছিলেন শেখ কামালের জহির ভাই। বঙ্গবন্ধুপুত্র কেন বিছানায় শোবেন না! শেখ কামাল মৃদু হেসে বলেছিলেন, আমি আপনার মাথার উপরে থাকব। বিছানার পাশে

থাকা টেবিলের ওপর ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি।শেখ কামালের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, বীর মুক্তিযোদ্ধার পাশে থাকতে চান তিনি। কেননা, বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখে ছুটে এসেছেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য। অসম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। প্রাণ দিচ্ছেন। শেখ কামাল এরপরও আন্তরিকতার সঙ্গে মনে করিয়ে দেন, জহির ভাই! সাবধানে লড়বেন। বেঁচে থাকতে হবে। শেখ কামাল যে বঙ্গবন্ধুর অনেক গুণ পেয়েছিলেন তা এই আলাপচারিতা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় হলো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে এসেছেন প্রিয় মাতৃভূমিতে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে কাজী সাজ্জাদ আলী জহির গিয়েছিলেন ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে। শেখ কামাল বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন জহির ভাইকে। বঙ্গবন্ধুকে মজা করে বলেছিলেন, আমি কিন্তু জহির ভাইয়ের মাথার ওপরে ছিলাম! বন্ধুবৎসল শেখ কামাল এভাবেই আপন করে নিতেন সবাইকে, আপন হয়ে উঠতেন সবার। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের একজন সদস্য হিসেবে ছাত্র রাজনীতিতে ভূমিকা রাখছিলেন শেখ কামাল। তরুণদের রাজনীতি সচেতনতার পাশাপাশি খেলার মাঠে, নাটক-সংগীতসহ সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি তিনি, নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও সম্পৃক্ত ছিলেন এসবে। '৬৬-তে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণার পর বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশে দানা বাঁধে বাঙালির ঐক্য। '৬৮-তে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বানিয়ে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পথ বেয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে এনে '৭০-এর নির্বাচনে একচেটিয়া জয়লাভ করলেও পাকিস্তানের কূটকৌশলে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানায় গণমানুষের মতোই শেখ কামালও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ থেকে নির্দেশনা নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার "যার যা কিছু আছে, তা নিয়ে প্রস্তুত" থাকার নির্দেশ মেনে শেখ কামাল আবাহনী ক্রীড়াচক্রের খেলার মাঠে এলাকার প্রায় ৫০ জন তরুণকে অস্ত্র পরিচালনার ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন শওকত আলী দিয়েছিলেন ট্রেনিং। বাঙালি তরুণরা মুখে কাপড় বেঁধে অবাঙালি বাড়িগুলোতে গিয়ে হুমকি-ধমকি দিয়ে ৮০টির মতো অস্ত্র জোগাড় করেছিলেন। জাতির পিতা স্বাধীনতা ঘোষণার পর এই অস্ত্রগুলো নিয়ে যুদ্ধে যায় তরুণের দল। শেখ কামালও গেলেন। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তিনি তার কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। বাংলাদেশের মঞ্চনাটকের অন্যতম প্রধান দল ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন শেখ কামাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার সলিমুল্লাহ হলের বার্ষিক নাটকে নিয়মিত অভিনয় করতেন তিনি। '৭২ সালে ডাকসুর নাটকের দলের অংশ হয়ে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর অনুবাদে জর্জ বার্নার্ড শ'র লেখা নাটক 'কেউ কিছু বলতে পারে না' মঞ্চস্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শেখ কামাল। তার বিপরীতে ছিলেন ফেরদৌসী মজুমদার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দলের সহঅধিনায়ক ছিলেন শেখ কামাল। ১৯৭৪-'৭৫ মৌসুমে খেলেছেন জাতীয় ক্রিকেট লিগ। ভলিবল-হকি-ব্যাডমিন্টনেও তার কৃতিত্ব ছিল ঈর্ষণীয়। অ্যাথলেট হিসেবেও কম যাননি, ১৯৭৫ সালে স্যার সলিমুল্লাহ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সেরা হয়েছিলেন। ক্রীড়াপাগল মানুষটি খেলাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন পারস্পরিক যোগাযোগ -সম্প্রীতি গড়ে তোলার কাজে। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি মানুষকে নির্মল বিনোদন দিতে তিনি সার্কাস দল গড়ে তুলেছিলেন।

কামালের প্রচলিত লোকগীতি-রবীন্দ্র -নজরুল-আধুনিক গানের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তরুণ প্রজন্মের জন্য একদম তাজা স্বাদের পপ ঘরানার সংগীত। ছিলেন সে সময়ের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি একজন প্রতিভাবান ক্রীড়া সংগঠক ছিলেন। হকি, বাস্কেটবল, ফুটবলের মতোই ক্রিকেট খেলাকে জনপ্রিয় করতে চাইলেন। ফুটবলার সালাহউদ্দিন খেলতেন মোহামেডানে, তাকে নিয়ে এলেন নিজের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব আবাহনী ক্রীড়াচক্রে। বড় বোন শেখ হাসিনা ১৯৭৫-এর ৩১ জুলাই গেলেন জার্মানিতে। বিদেশ থেকে কী আনবেন, ছোট ভাইকে এই প্রশ্ন করলে বড় বোনের কাছে ছোট ভাই কামালের আবদার ছিল, খেলোয়াড়দের জন্য অ্যাডিডাসের বুট জুতা নিয়ে আসতে। নিজেও যখন বিদেশে গেছেন, খেলোয়াড়দের জন্য ক্রীড়াসামগ্রী খুঁজেছেন। ক্লাবে এনেছেন বিদেশি কোচ, যা সেই সময়কার বাংলাদেশে প্রথম। কলকাতায় খেলতে গেছে আবাহনী ফুটবল দল, সবার গায়ে জার্সি, যা যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের খেলোয়াড়দের অসহায়ত্ব ছাপিয়ে উন্নত রুচির পরিচয় দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রেখেছেন, অথচ মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেননি। চাইলেই উপভোগ করতে পারতেন সেনাবাহিনীর নিশ্চিত জীবন। তিনি বরং দেশ গড়ে তোলার সংকল্পে সেনাবাহিনী ছেড়ে নেমে এলেন সাধারণ মানুষের কাতারে।

প্রধানমন্ত্রীর ছেলে, উপরন্তু ভালো ছাত্র হিসেবে চমৎকার পেশাগত জীবনও বেছে নিতে পারতেন তিনি। অনেকের মতো উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যেতে পারতেন। তিনি এসব কিছুই করেননি। দেশ গড়ার দায়বদ্ধতা থেকে যেখানেই ঘাটতি দেখেছেন, ছুটে গেছেন পূরণ করতে, যেমন- ১৯৭৪ সালের বন্যার সময় রাজনৈতিক -সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে বন্যার্তদের সাহায্যে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি ছিলেন অগ্রগামী কর্মী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, দেশের ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশে তার বিরাট অবদান রয়েছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে ও ক্রীড়ার দিক থেকে আজকে যে উৎকর্ষতা, স্বাধীনতার পর বিশেষ করে, সেখানে শেখ কামালের একটা বিরাট অবদান রয়েছে। শেখ কামালের সাদাসিধে জীবনে দেশকে গড়ে তোলা, দেশের মানুষের পাশে থাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা ক্রীড়া অঙ্গন- এইসব কিছুর উন্নতি করা, এটাই ছিল তার কাছে সব থেকে বড় কথা।

লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সংকটে সংগ্রামে 'নির্ভীক' এক নারী

শামস সাইদ

'বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপসহীন নেতা। বজ্রকঠিন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। সেই বজ্রের বারুদ ছিলেন বেগম মুজিব। তাঁর সমর্থন, সাহায্য ও পূর্ণ একাত্মতা ছাড়া বঙ্গবন্ধু কতটা আপসহীন নেতা হতে পারতেন? বঙ্গবন্ধু হতে পারতেন? সে প্রশ্ন তৈরি হবে বেগম মুজিবের জীবন পাঠ করলে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। সাহস, শক্তি এবং সকল দুঃখ ও নির্যাতন বরণের ধৈর্য ও প্রেরণা জুগিয়েছেন মহীয়সী এই নারী। যদি বেগম মুজিব আত্মসর্বস্ব হতেন, সংসারসর্বস্ব হতেন, ছেলেমেয়ে, স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করতে চাইতেন, তাহলে শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব হতো না রাজনৈতিক কারণে বছরের পর বছর কারাগারে অন্তরীণ থাকা। বঙ্গবন্ধু জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন কারাগারে। মুক্ত হয়েও যে পরিবারের কাছে ফিরেছেন এমন নয়।'

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব রেখেছেন অনন্য ভূমিকা। তিনি ইতিহাসের কোনো চরিত্র না। ছিলেন না রাজনৈতিক কোনো পদে। ছিলেন না রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে। তবু তিনি ছিলেন সর্বত্র। ইতিহাস তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেনি- পারবে না। কারণ, তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। বাংলাদেশের ইতিহাস কিংবা বঙ্গবন্ধুকে লিখতে গেলে বেগম মুজিবকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না।

বেগম ফজিলাতুন নেছা'র জীবনে যেমন জড়িয়ে আছেন বঙ্গবন্ধু- তেমনি বঙ্গবন্ধুর জীবনেও জুড়ে আছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন বেশ চড়াই-উৎরাইয়ের

মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সেই সময়ে বেগম মুজিবের ভূমিকা, বিচক্ষণতা, ত্যাগ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনে স্ত্রীকে শুধু সহধর্মিনীই নয়, পেয়েছিলেন সহযোদ্ধা ও সহকর্মী হিসেবে। বঙ্গবন্ধু- বিশ্ববন্ধু হতে পেরেছিলেন তাঁর স্ত্রীর প্রণোদনায়; অবশ্য স্বীকার্য যে, এতে তাঁর নিজস্ব মেধা-মনন ও উদ্যম-উদ্যোগও ছিল। তবে দু'জনের মধ্যে ব্যাপারটি ছিল অন্যরকম, একজন মুক্তির মশাল জ্বালিয়ে একটি জাতিকে মুক্ত করার চেষ্টায় ছুটেছিলেন। চাচ্ছিলেন অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে। অন্যজন সেই মশালে জ্বালানি সরবরাহ করেছেন। এখানে এসেই তাঁরা একে অপরের সম্পূরক/পরিপূরক হয়ে উঠলেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপসহীন নেতা। বজ্রকঠিন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। সেই বজ্রের বারুদ ছিলেন বেগম মুজিব। তাঁর সমর্থন, সাহায্য ও পূর্ণ একাত্মতা ছাড়া বঙ্গবন্ধু কতটা আপসহীন নেতা হতে পারতেন? বঙ্গবন্ধু হতে পারতেন? সে প্রশ্ন তৈরি হবে বেগম মুজিবের জীবন পাঠ করলে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। সাহস, শক্তি এবং সকল দুঃখ ও নির্যাতন বরণের ধৈর্য ও প্রেরণা জুগিয়েছেন মহীয়সী এই নারী। যদি বেগম মুজিব আত্মসর্বস্ব হতেন, সংসারসর্বস্ব হতেন, ছেলেমেয়ে, স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করতে চাইতেন, তাহলে শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব হতো না রাজনৈতিক কারণে বছরের পর বছর কারাগারে অন্তরীণ থাকা। বঙ্গবন্ধু জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন কারাগারে। মুক্ত হয়েও যে পরিবারের কাছে ফিরেছেন এমন নয়। তখন পুরো দেশ হয়ে উঠেছিল তাঁর পরিবার। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ছিল সেই পরিবারের সদস্য। তাই বেরিয়ে পড়তেন মানুষের মুক্তির সংগ্রামে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আবার ছুটতেন পশ্চিম পাকিস্তানে। সেই সময় তাঁর সংসার-স্ত্রী-সন্তানের চিন্তা থেকে মুক্ত করেছিলেন বেগম মুজিব। কখনো অভিযোগ তো করেননি, উল্টো সাহস জুগিয়েছেন। অর্থ দিয়েছেন। যদি এর উল্টো হতো, তাহলে স্ত্রী-সন্তানের সুখের কথা চিন্তা করে স্বাধীনতা সংগ্রামের দুঃসাহসী পথে যাত্রা না করে বঙ্গবন্ধু বাধ্য হতেন সংসারমুখী হতে। সংগ্রাম রেখে হাল ধরতে হতো সংসারের। তাহলে স্বাধীনতা স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যেত বাঙালির মননে ও বাংলার আকাশে।

বেগম মুজিবের সেই ত্যাগের কথা, সংগ্রামের কথা বাঙালির অজানা নয়। বঙ্গবন্ধু যেন দুর্গের মতো বাড়ি, সেই দুর্গের কর্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা। স্বামীর চাইতেও কঠিন ও অনমনীয় ছিলেন তিনি। জীবনে অসহ দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করেছেন। কিন্তু স্বামীকে প্রলোভনের কাছে মাথা বিক্রি করতে দেননি। ক্ষমতা কিংবা অর্থের মোহে কখনো আপোস করতে দেননি।

মুজিব-রেণুর দাম্পত্যজীবন ব্যতিক্রমী। পারিবারিক কারণে বাল্যবিয়ে হয়েছিল তাদের। সেকথা বঙ্গবন্ধুও লিখেছেন 'আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার-তের হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পর ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বড়ো ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।'... আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধহয় তিন বছর হবে।'

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম ছিল বন্ধুর পথে বিচরণের; বাড়ি ছিল তাঁর জন্য স্বল্পদিনের মুসাফিরখানা; কারাগারে কেটেছে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তাহলে বঙ্গবন্ধুর পরিবার চলতো কীভাবে? কে এতসব সামলাতো? আমাদের অনেকের জানা নেই বত্রিশ নম্বর বাড়ির ইতিহাস। ইট বহন করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু দেখভাল করেছেন বঙ্গবন্ধুর রেণু। বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে না হয় দেশ-মানুষলগ্ন। বাড়িলগ্ন হতে পারেননি। সংসার সামলানো, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া আবার কখনো দল সামলানো, দলের নেতাকর্মীদের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো। সবটাই হাসিমুখে করেছেন বেগম মুজিব।

বঙ্গমাতা নিজেই বলেছেন সেসব কথা, কীভাবে ছেলেমেয়েদেরকে মানুষ করেছেন, 'আমি চুবনি খাইয়া খাইয়া সাঁতার শিখছি, বাচ্চাদের এতটুকু বিলাসিতা শিখাই নাই।' তাঁকে কখনও সুসজ্জিতা দেখা যায়নি; গ্রামের সাধারণ নারীর মতো ছিল তাঁর চলাফেরা। ছেলেমেয়েদেরকেও কখনও বিলাসপ্রবণ মনে হয়নি।

কারাজীবন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দুশ্চিন্তা না থাকলেও বেগম মুজিব ভাবতেন সময়টা কাজে লাগুক। শুয়ে বসেই তো কাটাচ্ছে। নতুন বই নিয়ে যেতেন। কখনো বঙ্গবন্ধু বলতেন নতুন বইয়ের কথা। সেসব নিয়ে হাজির হতেন তিনি। নিঃসঙ্গ জীবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী ছিলো বই। একদিন বেগম মুজিব নিয়ে গেলেন চারটা খাতা। যা দেখে রীতিমতো বঙ্গবন্ধু অবাক। এসব দিয়ে কী করবেন!

অসমাপ্ত আত্মজীবনীর শুরুতে বঙ্গবন্ধুর তুলে ধরেছেন সেকথা, 'আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।' বঙ্গবন্ধুর লেখালেখির অনুপ্রেরণায় যে বেগম মুজিব সেটা আমরা দেখতে পাই। রাজনীতিবিদ -রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর পেছনে ষোলআনা অবদান না থাকলেও লেখক বঙ্গবন্ধুর ষোলআনা অবদান বেগম মুজিবের।

বেগম মুজিব রাজনীতি না করলেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল তাঁর। শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'আন্দোলন কীভাবে করতে হবে, সেটা মায়ের কাছ থেকেই শেখা।' প্রকাশ্যে নয়, আড়ালের রাজনীতিবিদ ছিলেন বঙ্গমাতা। গেরিলার মতো যোদ্ধা, গেরিলা রাজনীতিবিদ। স্বামীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থেকেও দেশে কী ঘটছে, জনগণ কী ভাবছে আর বলছে, তার খোঁজখবর রাখতেন। ৩২ নম্বরে খাটের ওপর বসে শুধু পান বানাতেন না। সারাদেশের রাজনীতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তিনি।

ছয়-দফাভিত্তিক আন্দোলন নিয়ে বঙ্গবন্ধু দ্বিধান্বিত ছিলেন। বঙ্গমাতা পরামর্শ দিলেন, আমি বলেছি, বুড়াদের নিয়ে আপনি এত ঘাবড়ান কেন? আপনার রয়েছে হাজার হাজার

তরুণ কর্মী, ছাত্র, যুবক। তারা আপনার ডাক শুনলে হাসিমুখে আন্দোলনে ঝাঁপ দেবে।' উনসত্তরে যখন গণঅভ্যুত্থানে সারাদেশ উত্তাল তখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি বঙ্গবন্ধু প্যারোলে আইয়ুব খানের সঙ্গে আলোচনা করতে যাবেন, এমন একটি প্রস্তাব দেয়া হলো। আওয়ামী নেতারাও রাজী। বঙ্গবন্ধু দ্বিধাগ্রস্ত। তা দূর করলেন বেগম মুজিব। শেখ হাসিনাকে দিয়ে বার্তা পাঠালেন, 'আপনি যদি প্যারোলে মুক্তি নিয়ে আইয়ুবের গোলটেবিলে যান, তাহলে বত্রিশ নম্বরে আর ফিরবেন না। হাতে বটি নিয়ে বসে আছি, প্যারোলে মুচলেকা দিয়ে আইয়ুবের দরবারে যেতে পারেন; কিন্তু জীবনে ৩২ নম্বরে আসবেন না।' বেগম মুজিবের কথা রাখলেন বঙ্গবন্ধু। তারপরের ইতিহাস তো সবারই জানা।

৭ মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের শ্রেষ্ঠতম ভাষণ। কিন্তু ভাষণের আগের সময় ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনে কঠিনতম। সারাদেশ তাঁর দিকে তাকিয়ে। আওয়ামী নেতারা একমত ছিলেন স্বাধীনতা ঘোষণা করা সমীচীন হবে না; তবে পূর্বশর্ত ঘোষণা করে আন্দোলন চলমান রেখে ইয়াহিয়াকে চাপে রাখতে হবে। স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সামরিক জান্তা রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়ার সুযোগ পাবে। আবার ছাত্রনেতাদের দাবি, স্বাধীনতা ঘোষণা করতেই হবে। মানসিক চাপের মধ্যে বঙ্গবন্ধু, দ্বিধা তো ছিলই। এই পরিস্থিতিতে কী বলতে হবে তা বলে দিলেন বেগম মুজিব। প্রশ্ন করলেন, আপনার মন কী চায়? বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চাই। বঙ্গমাতা বললেন, আপনার মন এবং বিবেক যা চায়, আজ তাই করুন। ভয়ে পিছিয়ে যাবেন না। তাঁর শেষ কথা ছিল, মনে রাখবেন, আপনার পেছনে বন্দুক, সামনে জনতা। বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেলেন দ্বিধা থেকে। ঠিক তাঁর মন যা বলতে চেয়েছে তাই বলেছিলেন সেদিন।

২৩ মার্চ ঘিরেও বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের মতো উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন; সেদিন ৩২ নম্বর বাড়িসহ সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উড়বে। আওয়ামী নেতারা ভিন্নমত পোষণ করলেন। তাদের কথা ছিল, ইয়াহিয়া -ভুট্টোর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো মানে তাদের উসকানি দেয়া, যা বঙ্গবন্ধুও করতে চাচ্ছিলেন না, কিন্তু ছাত্রনেতাদের চাপও সামলাতে পারছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে বঙ্গমাতা বললেন, 'আপনি ছাত্রনেতাদের বলুন, আপনার হাতে পতাকা তুলে দিতে। আপনি সেই পতাকা বত্রিশ নম্বরে ওড়ান। কথা উঠলে বলতে পারবেন, আপনি ছাত্র-জনতার দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন।

স্বাধীনতা লাভের পরে রাষ্ট্র চালাতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু যখনই সংকটে পড়েছেন সেখানে পথের সন্ধান দিয়েছেন বেগম মুজিব। ১৯৭৪ লাহোরে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ বৈঠক যাবেন কিনা বঙ্গবন্ধু দ্বিধায় ছিলেন। ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, সম্মেলনে যেতে রাজি হন বঙ্গবন্ধু। এবার স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ালেন বেগম মুজিব। তাঁর দ্বিমতের সপক্ষে দুটো যুক্তি তুলে ধরলেন। বঙ্গবন্ধু লাহোরে গেলে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ভুট্টোকে ফিরতি সফরের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। ভুট্টো ঢাকায় এসে বাংলাদেশ-বিরোধী পাকিস্তানপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ দৃঢ় করবে। পাকিস্তানে বাংলাদেশের দূতাবাস না থাকায় বঙ্গবন্ধুর দেখভাল করবে পাকিস্তান, যা বিপজ্জনক। এই সন্দেহ অমূলক ছিল না। ভুট্টো বাংলাদেশে এসে ঠিক সে কাজটি করেছিলেন, যার কথা বঙ্গমাতা আগেই বলে দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্য বেগম মুজিব ছিলেন শক্তিদায়িনী, প্রেরণাদায়িনী। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির বটবৃক্ষ; আর বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুর ছায়াবৃক্ষ। তাই বঙ্গমাতা বা বঙ্গবন্ধুর রেণুকে বাদ দিয়ে বাংলার ইতিহাস পূর্ণতা পেতে পারে না। ৮ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর রেণুর জন্মদিন। বাঙালির হৃদয়ে রয়েছে তাঁর স্থান।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম ছিল বন্ধুর পথে বিচরণের; বাড়ি ছিল তাঁর জন্য স্বল্পদিনের মুসাফিরখানা; কারাগারে কেটেছে তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তাহলে বঙ্গবন্ধুর পরিবার চলতো কীভাবে? কে এতসব সামলাতো? আমাদের অনেকের জানা নেই বত্রিশ নম্বর বাড়ির ইতিহাস। ইট বহন করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু দেখভাল করেছেন বঙ্গবন্ধুর রেণু। বঙ্গবন্ধু তখন কারাগারে না হয় দেশ-মানুষলগ্ন। বাড়িলগ্ন হতে পারেননি। সংসার সামলানো, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া আবার কখনো দল সামলানো, দলের নেতাকর্মীদের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো। সবটাই হাসিমুখে করেছেন বেগম মুজিব। বঙ্গমাতা নিজেই বলেছেন সেসব কথা, কীভাবে ছেলেমেয়েদেরকে মানুষ করেছেন, 'আমি চুবনি খাইয়া খাইয়া সাঁতার শিখছি, বাচ্চাদের এতটুকু বিলাসিতা শিখাই নাই।' তাঁকে কখনও সুসজ্জিতা দেখা যায়নি; গ্রামের সাধারণ নারীর মতো ছিল তাঁর চলাফেরা। ছেলেমেয়েদেরকেও কখনও বিলাসপ্রবণ মনে হয়নি।

মেঘ-মল্লার ডোরে

এস এম তিতুমীর

কদম-কেয়া ঝরে, অধরে। থরে থরে
আগ্রাসী বুনো বেগ, সঘন আবেগ
লজ্জার মাথা খেয়ে। যেটুকু চলেছে বেয়ে
পূর্ণ প্রেমের পূর্ণিমা হয়ে। এ চোখ ও চোখে-
ব্যবধান ভুলে, এক হলে দৃষ্টি
ঝরে অঝরে বৃষ্টি। -ও বৃষ্টি
নিমগ্ন চেতন তনুর তরঙ্গমায়, জল নাই
নুন ভরা ঘাম, মেঘে ভাসা আমি,
আমার আদিম প্রদান। প্রিয়, তুলে নিয়ো-
মল্লার বাহু, জলে ভেজা ওম। প্রীতির সমন
পড়ে নিয়ো একবার, আজন্ম আষাঢ়
অসাড়, করেনি আকাশ তার। বিনিময় ডোরে

সেইতো অনাদিকালের অবদমন, দুর্বার আকর্ষণ
আমি ভিজিয়ে তুলি তোমার তরুণ যুগল, বসন্ত আগল
আর আজন্ম পুষে রাখা আকম্পিত শ্রাবণের ওই ভোরে
মেঘ-মল্লারও ডোরে। আমার বরষা, তোমার আকাশে
তৃষিত চিরদিন, কেবল ঘোরে আর ঘোরে

পাখিজাত স্বভাব

রফিকুল নাজিম

খাঁচা খুলে দিলে পাখিরা চলে যায়
মায়ার শিকল খুলে দিলে পাড়ি দেয় উদোম আকাশ
অন্য কোথাও অন্য কোনখানে
অন্য মায়ায় বাসা বাঁধে,
অন্য মায়ায় গড়ে তোলে পাতাদের সংসার।
ঋতুচক্রের পালাবদলে
কিংবা মায়ার টানে সেই পাখি একদিন ফিরে আসে
সেই খাঁচার আশপাশে ঘুরঘুর করে
তীব্র শৈত্যপ্রবাহে সেই নাতিশীতোষ্ণ বুকের ওম খোঁজে,
শুধু পাখি আর সেই খাঁচায় ঢোকে না।

মানুষও পাখিজাত স্বভাব তার বুকে পুষে রাখে।

সেদিন ছিল পহেলা আষাঢ়

শামীমা নাইস

মনে পড়ে আমাদের প্রথম দেখার দিনটি?
সেদিন ছিল পহেলা আষাঢ়
মেঘ সেজেছিল জরিপাড় শাড়িতে
আমি বললাম, আজ তুমুল বৃষ্টি হবে
শুকিয়ে যাওয়া আমার শহর ভিজবে
মনের সুখে, চুপটি করে।

তুমি বললে
ঝুনুঝুনু নামুক বৃষ্টি
আজ আমরা ময়ূর হবো
টুপুর মাথায় পেখম মেলে
নাচব আদিম সুখে।

আমি বললাম
তা হবে না
বৃষ্টি নামলেই আমরা হবো
শুভ্র কোমল হংসযুগল
সুউচ্চ গ্রীবা তুলে
আকাশ ছোঁয়ার বাসনাতে
অকৃত্রিম ভালোবেসে
লেবু-রঙ ঝিলের জলে
ভাসব দুজন।

সেদিন থেকেই যাত্রা শুরু
সঙ্গে নিয়ে সেদিনের সেই
বৃষ্টিভেজা স্বপ্নগুলো...

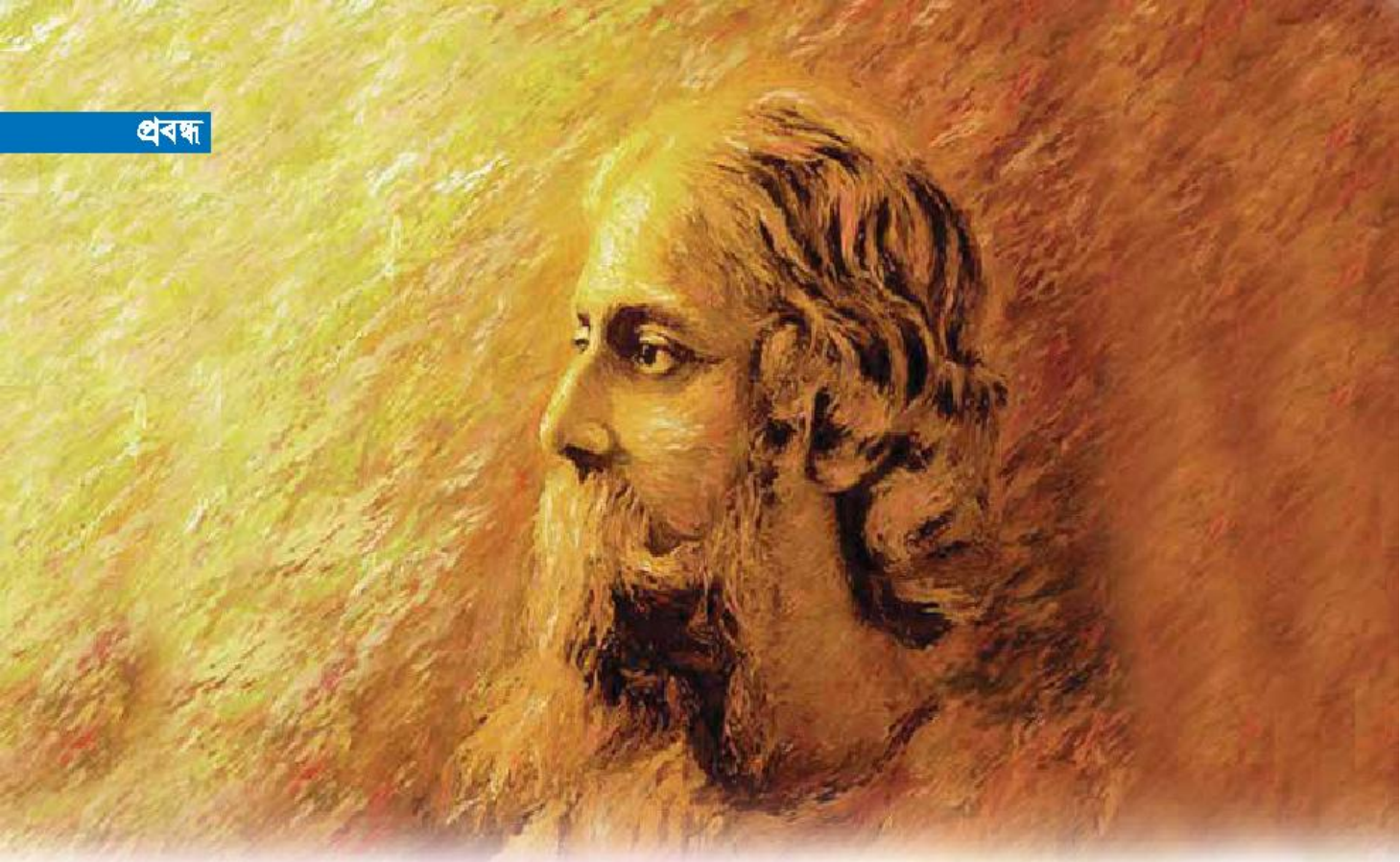

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী শিলাইদহ

আরিফা খানম

> ‘প্রকৃতিপ্রেমী ও মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী এবং বিস্তৃত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, সমাজ-সংস্কারক এবং চিন্তাবিদ। কবি সম্পর্কে অনেকের ধারণা কবি বাস্তববাদী নন, তিনি কল্পলোকে বিচরণ করেন। তবে কবির জীবন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তিনি তাঁর কাছে আসা মানুষকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন। গরিব-দুঃখী প্রজারা এলে ওদের দেখে তিনি ব্যথিত ও পীড়িত হয়েছেন। আর তাই তিনি অন্তর থেকে উচ্চারণ করেছেন, ‘এই সব ম্লান মূঢ় মুখে দিতে হবে ভাষা,/ এই সব শীর্ণ শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।’

সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালজয়ী এক অসাধারণ প্রতিভা। সাহিত্যের প্রায় সবকটি ধারাই তাঁর লেখনির স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়েছে। একথা ঠিক যে কোনো সাহিত্যের বিশাল অঙ্গন একজনমাত্র লেখকের দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তারপরও বলা যায় কবিগুরু তাঁর বিশাল প্রতিভার স্পর্শে আমাদের বাংলা সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি সাধন করেছেন তা কারো সাথে তুলনা করা চলে না। একটা যুগের সৃষ্টি করেছেন তিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল যেন আত্মার সম্পর্ক। পৈত্রিক সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ, পতিসর ও শাহজাদপুরের জমিদারির অধিকারী হন। এই তিনটি স্থানই কবির পদচারণায় স্মৃতিধন্য হয়ে ওঠে রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষের কাছে।

কবি তাঁর যৌবনের যে সুবর্ণ সময়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন, সৃষ্টি করেছেন কালজয়ী নাটক, উপন্যাস, গান, কবিতা সেই সৃষ্টিমুখর দিন কেটেছে এই জমিদারি এলাকায়। তবে সপরিবারে বসবাসের জন্য কবি বেছে নিয়েছিলেন কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ। তাই সহজেই অনুমান করা যায় শিলাইদহ কবির জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছিল। কবির সাহিত্যজগতে শিলাইদহ যে কতটা বিশাল ভূমিকা রেখেছিল শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর লেখায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়, 'রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভবত অর্ধাংশেরও বেশি জন্মলাভ করে শিলাইদহের বোটে পদ্মাবক্ষে, এই কুঠিবাড়িতে, গোরাইয়ের বক্ষে ও পদ্মার চরে। তাঁর প্রথম যৌবনের ছোটগল্পের স্থান শিলাইদহে। তাঁর প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই শিলাইদহের প্রাকৃতিক পটভূমিকায় রচিত।' (শচীন্দ্রনাথ অধিকারী: শিলাইদহ পরিচয়)

শিলাইদহের নদীবেষ্টিত নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর কবিমনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। পতিসর, শাহজাদপুর ও শিলাইদহের মধ্যে কবির কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল শিলাইদহ, তার কারণ ছিল প্রমত্তা পদ্মা। পদ্মা শিলাইদহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সেখানকার প্রাকৃত জীবন-জনপদের বাস্তবচিত্র রবীন্দ্রনাথের চেতনায় আমূল পরিবর্তন আনে। শিলাইদহ ও পতিসর এলাকায় দীর্ঘ দিন অবস্থান কবির চিন্তা-চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। সৌন্দর্যপিপাসু কবি নতুন নতুন কাব্য ও সাহিত্য চিন্তায় যেমন বিভোর হয়েছেন তেমন সমাজ উন্নয়ন ও জনহিতকর কাজে ভূমিকা রেখেছেন। মৈত্রেয়ী দেবী 'বাংলার মাটি বাংলার জল' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঐ নদীকূলেই কবির জীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল। চারপাশের সুখ-দুঃখ, জীবন-সংঘাত থেকে বিচ্ছিন্ন, চাঁদের পানে চক্ষু রাখা নয়, নদীর কলধ্বনি মেশানো মানুষের ছোট ছোট কলগানই কবির জীবনের সেই বৃহৎ অধ্যায়ের ভূমিকা।' শিলাইদহ গ্রামের উত্তরে পদ্মা এবং পশ্চিমে গড়াই নদী, এই দুই নদী শিলাইদহকে অর্ধ-চন্দ্রাকারে ঘিরে রেখেছে। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বসবাসকালে মাঝে মাঝে পদ্মা নদীতে বোটে কয়েকটি বই নিয়েও অবস্থান করতেন কবি। পদ্মাতীরের

> **জমিদারি পরিচালনার উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন হলেও প্রমত্তা পদ্মা, তারই পাশে ছায়াঘেরা এই নিভৃত পল্লির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে যেন আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। কবি জন্মগতভাবে একটা শিল্পীসত্তা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু সেই শিল্পীসত্তা বিকশিত করেছিল প্রমত্তা পদ্মা ও শিলাইদহের ছায়া সুনিবিড় গ্রামীণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। কবি তাঁর জীবন ও পার্থিব জগতের সৌন্দর্যকে নতুন করে উপলব্ধি করলেন এই শিলাইদহে। এই গ্রামীণ পটভূমিতে বিচিত্র পেশার নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, নিজের অন্তরকে সমৃদ্ধ করেছেন সৃষ্টির প্রয়োজনে। শিলাইদহের জীবন ও প্রকৃতি কবিকে কতটা মুগ্ধ করেছিল ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়, 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়।**

জীবনের নানা অনুষঙ্গ তিনি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন জনের কাছে লেখা চিঠিতে। পদ্মার সীমাহীন অপরূপ রূপের বর্ণনায় কবির অন্তরের গভীর ও একান্ত অনুভব 'ছিন্নপত্র' এর পাতায় পাতায় লিখে গেছেন। 'ছিন্নপত্র' এর বেশিরভাগ চিঠিই কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা। শিলাইদহের অবারিত মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি- যেখানে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, উন্মুক্ত নীল আকাশ, নদীর কলধ্বনি কবি চেতনায় এক ভিন্ন বার্তা এনে দেয়। স্তব্ধ নির্জনতা, সীমাহীন আকাশ এক উদাসীনতার জন্ম দেয় কবি মনে। সে ভাবের জগতে নিমগ্ন থেকে কবি তাঁর মনের নিগূঢ় সত্য উদঘাটন করেছেন। তাই সেখান থেকে লেখা চিঠিগুলোতে এর প্রকাশ গভীরভাবে অনুভূত হয়। তেমন মনে হয় অন্যকোথাও হয়নি। তবে কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ কখনই কাব্যে প্রকাশ করেননি। যখন জীবন ভোগের রস সবার হয়ে উঠতো তখনই কেবল তা তাঁর কাছে কাব্যের যোগ্য বলে সাহিত্যে স্থান পেত। ছিন্নপত্র'র প্রতিটি বক্তব্যে জীবন ও সৌন্দর্যের বর্ণনায় রয়েছে কবিমনের গভীর অনুভূতির প্রকাশ। শিলাইদহের স্মৃতি কবিমনের গভীরে নিভৃত যতনে নিরন্তর ধ্বনিত হয়েছে এবং তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্পের বিষয়বস্তু শিলাইদহ অঞ্চলের সংঘটিত ঘটনার থেকে নেয়া হয়েছে। তাঁর ছোটগল্প 'জীবিত ও মৃত' শিলাইদহের একটা ঘটনাকে ভিত্তি করে রচিত। 'বৈষ্টমী' গল্পের আখ্যানবস্তু সর্বক্ষেপী নামের এক স্থানীয় বৈষ্ণবী'র জীবন থেকে নেয়া। তাঁর 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'উর্বশী', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্যে'র কবিতা ও গান শিলাইদহে রচিত। 'সোনার তরী'র মোট তেতাল্লিশটি কবিতার মধ্যে তেরটিতে রয়েছে হয় নদী নয় সমুদ্র, নয় নদীতীরের গ্রাম। এই শিলাইদহে বসেই ১৯১২ সালে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ করেন কবি। ১৯১৩ সালে কবি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

অনেক রবীন্দ্র-গবেষক মনে করেন পদ্মা নদী বিশেষভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার বাহন হিসেবে কাজ করেছে। অধিকাংশ ছোটগল্পের বিষয়বস্তু নদীপারের জনপদের মানুষের জীবন। পল্লিগ্রাম ও নদী না থাকলে 'পোস্টমাস্টার' গল্পটা হতো অতিসাধারণ গল্প। পদ্মার রহস্যময় ক্ষুধার উপরেই 'খোকাবাবুর

প্রত্যাবর্তন' গল্পের ভিত্তি। 'শুভা' গল্পে পল্লি-গ্রামের নদী তীরের মেয়ে শুভা প্রকৃতির মতোই নির্বাক ছিল, তাই সে যেন প্রকৃতির সাথে একাকার হয়ে যায়। শহরে এনে বিয়ে দেয়ার পর যখন ধরা পড়ে শুভা কথা বলতে পারে না তখনই বিপত্তি শুরু হয়। 'ছুটি' গল্পের কিশোর ফটিক এই পল্লি-গ্রামেরই দামাল ছেলে, যে শহরের জীবনে খাপ খাওয়াতে না পেরে জীবন থেকে ছুটি নিয়েছিল। এইসব চরিত্র কবি তাঁর চোখে দেখা গ্রামীণ জীবন থেকে তুলে এনেছেন। গ্রামীণ জীবনের নানা অনুষঙ্গ তাঁকে উদ্বেলিত করেছে সাহিত্য রচনায়। বর্ষণমুখর আষাঢ়ে কবি লিখেছেন, 'পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ/ দুকূল বহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ/ দরদর বেগে জলে পড়ি জল/ ছল ছল ওঠে বাজিয়ে'...। কথা ও কাহিনি কাব্যের গানভঙ্গ, পুরাতন ভৃত্য ও দুই বিঘা জমির বক্তব্যে শিলাইদহের প্রভাব অত্যন্ত পরিষ্কার। সমগ্র গল্পগুচ্ছের অর্ধেকের বেশি গল্পই এই শিলাইদহ থেকে রচিত।

প্রকৃতিপ্রেমী ও মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী এবং বিস্তৃত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, সমাজ-সংস্কারক এবং চিন্তাবিদ। কবি সম্পর্কে অনেকের ধারণা কবি বাস্তববাদী নন, তিনি কল্পলোকে বিচরণ করেন। তবে কবির জীবন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তিনি তাঁর কাছে আসা মানুষকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন। গরিব-দুঃখী প্রজারা এলে ওদের দেখে তিনি ব্যথিত ও পীড়িত হয়েছেন। আর তাই তিনি অন্তর থেকে উচ্চারণ করেছেন, 'এই সব ম্লান মূঢ় মুখে দিতে হবে ভাষা,/ এই সব শীর্ণ শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ভাগ হয়ে গেলে শিলাইদহের সঙ্গে কবির যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় ১৯২২ সালে। তিনি শেষবারের মতো পরবর্তী মালিক ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে ১৯২৩ সালে শিলাইদহ আসেন। তবে আমৃত্যু শিলাইদহের স্মৃতি ভুলতে পারেননি। শিলাইদহ থাকাকালীন অনেক কবিতা ও সাহিত্য রচনার পাশাপাশি এ অঞ্চল থেকে, সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ থেকে এবং প্রকৃতি থেকে যে উপকরণ তিনি মনোজগতে আহরণ করেছিলেন তা পরবর্তীতে অর্থাৎ শিলাইদহ থেকে চলে যাওয়ার পরও তাঁর সাহিত্যকর্মে রসদ যুগিয়েছে। কবি তাঁর মনোভূমিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন এই শিলাইদহ, পতিসর, শাহজাদপুরের জীবন ও প্রকৃতি থেকে। যা তাঁকে অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছে সাহিত্য জগতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বহুমাত্রিক; কখনো রক্ষণশীল ধ্রুপদী শৈলিতে, কখনো হাস্যোজ্জ্বল লঘুতায়, কখনো দার্শনিক গভীরতায় আবার কখনো উচ্ছ্বাসে মুখরিত। রবীন্দ্রকাব্যের গভীরতা ও সৃষ্টিশীলতা চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় লোকসংগীতের লোকজ ধারার বিচিত্র প্রভাবে। শিলাইদহে বসবাসকালে বাউল সম্রাট লালন শাহসহ বিশিষ্ট বাউল কবিদের সংস্পর্শে আসেন কবি। এভাবেই নানা বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষের সান্নিধ্যে কবির মনোভূমি সমৃদ্ধ হয়, সমৃদ্ধ হয় আমাদের সাহিত্য জগত। তাঁর বসবাস ও সাহিত্য সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে শিলাইদহ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। এখানে জমিদারি জীবনের পাশাপাশি তাঁর কাব্য ও সাহিত্য জীবনের কর্মকাণ্ড চলেছে সমান্তরালভাবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহকে তার 'যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্য-রস-সাধনার তীর্থস্থান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৯ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত দীর্ঘ বারো বছর এখানে জমিদারি দেখাশোনা করেন। পাশেই প্রমত্তা পদ্মা, যে পদ্মা নদী কবির জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- তাঁর লেখা বিখ্যাত কাব্যগুলো এখানেই রচিত হয়েছে। 'খেয়া', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কথা ও কাহিনী'র মতো শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো এখানেই লেখা হয়। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'নৈবেদ্য' কাব্যের অনেক কবিতা ও গান এই শিলাইদহ থেকেই তিনি রচনা করেন।

জমিদারি পরিচালনার উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন হলেও প্রমত্তা পদ্মা, তারই পাশে ছায়াঘেরা এই নিভৃত পল্লির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে যেন আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। কবি জন্মগতভাবে একটা শিল্পীসত্তা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু সেই শিল্পীসত্তা বিকশিত করেছিল প্রমত্তা পদ্মা ও শিলাইদহের ছায়া সুনিবিড় গ্রামীণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। কবি তাঁর জীবন ও পার্থিব জগতের সৌন্দর্যকে নতুন করে উপলব্ধি করলেন এই শিলাইদহে। এই গ্রামীণ পটভূমিতে বিচিত্র পেশার নানা মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, নিজের অন্তরকে সমৃদ্ধ করেছেন সৃষ্টির প্রয়োজনে। শিলাইদহের জীবন ও প্রকৃতি কবিকে কতটা মুগ্ধ করেছিল ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়, 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপর প্রতি রাত্রে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে বোঝা যায়।'

শিলাইদহ কবির মনোজগতের উপর যে আবেগময় রেখাপাত করেছিল তা কবির বিভিন্ন লেখা থেকে অনুমান করা যায়। জন্মান্তরে বিশ্বাসী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারবার ফিরতে চেয়েছেন শিলাইদহে। আর তাই তিনি একসময় লিখেছেন, 'আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবারও কি কখনও জন্মগ্রহণ করব। আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায়, এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর, বাংলাদেশের এই সুন্দর একটা কোণে এমন নিশ্চিত মুগ্ধ মনে জলি বোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব!'

সবশেষে কবিপুত্রের কথা দিয়ে ইতি টানবো। একসময় কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ কবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,'গবেষক-জীবনচরিত -লেখকরা সঠিক খবর দিতে পারবেন, তবে সাধারণভাবে আমার ধারণা, বাবার গদ্য ও পদ্য দুরকম লেখারই উৎস যেমন খুলে গিয়েছিল শিলাইদহে, এমন আর কোথাও হয়নি।

লেখক: অধ্যাপিকা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ
হেলথ সায়েন্স, ঢাকা